যান্ত্রিক

পরিষদ্ পত্রিকা

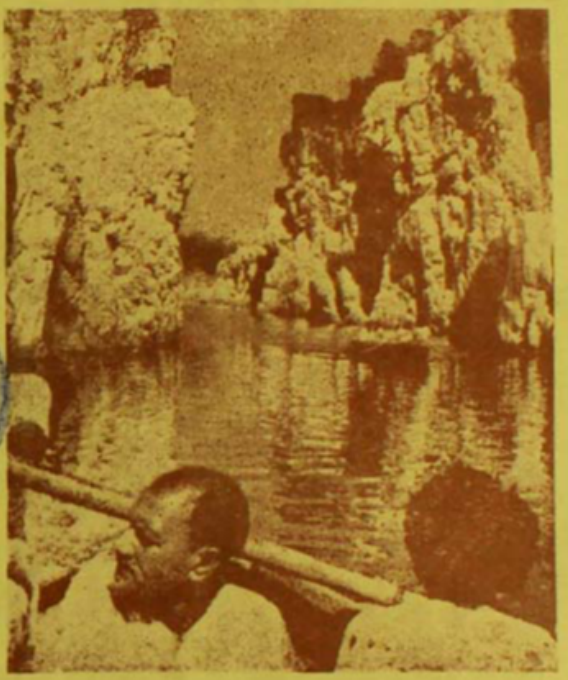

UNIVERSITY

চৈত্র

১৩৮৩

পত্রিকা পরিচয়

এই পত্রিকাটি পর্যটন তথা ভারতীয় ইতিহাস, শিল্প-কলা, কৃষ্টি, দর্শন, ভাবধারা এবং সংস্কৃতি বিষয়ক রচনার বাহক। পর্যটন-ভিত্তিক নিবন্ধাদির প্রকাশ এবং সাধারণ পর্যটকদের উপযোগী ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রচারই এই পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য।

বিভাগ সমূহ

ভ্রমণ-কাহিনী — সত্য-নিষ্ঠ ভ্রমণ-কাহিনী এই বিভাগে প্রকাশিত হয়।

পথ-নির্দেশ — ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ দর্শনীয় স্থান ও দ্রষ্টব্যের পরিস্থিতি নিয়মিতভাবে এই বিভাগে প্রচারিত হয়।

অবিস্মরণীয় — স্মরণীয় ঘটনা, স্থান, পাত্র, সৌধ, স্মারকাদি বিষয়ক রচনার সমৃদ্ধ এই বিভাগ।

রম্য-রচনা — এই বিভাগে জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শনাদি ভিত্তিক রচনা তথা প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের পুনরাবৃত্তি প্রকাশিত হয়।

আপনাদের চিঠি : ভারতের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান হ'তে আমাদের আমন্ত্রণ প্রতিনিধি প্রেরিত বার্তা এই বিভাগে পরিবেশিত হয়।

বিচিত্রা : নানা বিষয়ের সমৃদ্ধ-রচনা প্রকাশিত হয় এই বিভাগটিতে।

যান্ত্রিক পরিষদ্ পত্রিকা কোনও সংস্থার মুখ-পত্র নয়
ইহা নিয়মিত মাসিক পত্রিকা

পর্যটন এবং ভারত-তত্ত্ব বিষয়ক মাসিক

যাত্রিক

পরিক্রমণ পত্রিকা

সম্পাদিকা : শ্রীমতী শুভ্রা বসু

তৃতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা • চৈত্র ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ

সম্পাদকীয়

ভ্রমণ-কাহিনী :

সহ্যাদ্রির অন্তরালে — শ্রী চন্দ্রশেখর

রূপমতীর দুর্গে — শ্রী বীণাধর

পথ-নির্দেশ :

যদি যেতে চান — বিভাগীয় সম্পাদক

রম্য-রচনা :

ভারতের মন্দির — শ্রী শংকরনারায়ণ

ভারতীয় শাস্ত্রাবলী — শ্রী সত্যার্থী

মনে পড়ে — শ্রীমতী শুভ্রা বসু

বাক্‌সার দেব দেউল — শ্রী ভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

কিশোরদের জন্য :

জাতক-কথা — একলব্য

জিজ্ঞাসা : — সম্পাদিকা

পর্যটন প্রত্যক্ষ-জ্ঞান বৃদ্ধি করে;—হৃদয়ের প্রসারতা ঘটায়

ধারে কাছেও আসছেনা। ওলোটা নিজেও মাছে মুখ দিচ্ছেনা।

মাছ ধরা দেখে নদীর ধারের রাস্তা রিভার রোড দিয়ে একটু গিয়ে বাঁ-দিকের একটা পথে ঢুকলো অমিয়রা। রাস্তাটার নাম রোজ্ রোড। রোজ্ রোড ধরে অল্প একটা ছোট রাস্তায় পড়ে কিছুটা যেতেই এলো সেন্ট্ ফ্রান্সিস্ চার্চ্।

অতনুরা ভিতরে ঢুকলো।

ঐ গির্জাতেই সমাধি দেওয়া হয়েছিল ভাস্কো-দ্য-গামাকে, ১৫২৪ খৃস্টাব্দে। ১৫৩৮ সালে তার ছেলে এসে শবটি নিয়ে যায় পোর্তুগালে। প্রবাদ আছে, গির্জাটির প্রতিষ্ঠাতা ভাস্কো-দ্য গামা স্বয়ং। নির্মাণকাল ১৫০৩ খৃস্টাব্দ।

গির্জাটির সংরক্ষণ ব্যবস্থা ভালো নয়। যিনি দেখাশোনা করেন তিনি গির্জার ভিতরে মেঝের এক জায়গা দেখিয়ে বললেন: এইখানে সমাহিত করা হয়েছিল ভাস্কো-দ্য-গামাকে

: এটি কোন সম্প্রদায়ের চার্চ্? জিজ্ঞেস করলো অতনু।

: প্রোটেস্ট্যান্ট্দের। ভদ্রলোক বললেন।

: আগে যখন পোর্তুগীজদের দখলে ছিল তখন নিশ্চয়ই প্রথমে ছিল রোম্যান্ ক্যাথলিক। কবে থেকে প্রোটেস্ট্যান্ট্ হয়েছে?

: কোচ্চি লন্দকর্দের দখলে গেলে ১৭৭৯ খৃস্টাব্দে তাঁরাই এই গির্জাকে প্রোটেস্ট্যান্টপন্থী করেন। ১৮০৪ সালে চার্চ্ অব্ ইংল্যাণ্ড্ এর কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন।

কোচ্চিতে ডাচ্ বা ওলন্দাজদের বলা হয়,—লন্দকর্ বা লন্তকর্।

১৫০০ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বরের শেষাশেষি পোর্তুগীজ নায়ক Pedro Alvarez Cabral কোচ্চিতে এসে উপস্থিত হয়। তখন থেকেই কোচ্চিতে হয় পোর্তুগীজ আধিপত্যের সূত্রপাত। ৮ই জানুয়ারি ১৬৬৩ খৃস্টাব্দে ওলন্দাজরা ফোর্ট কোচ্চি অধিকার করে এবং ১৭৯৫ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত কোচ্চি তাদের অধীনে থাকে। পরবর্তীকালে বৃটিশরা এর মালিক হয়ে বসে।

: চলো এবার ফোর্ট্কোচ্চি। শেখরদা তাগিদ দিলেন।

ওরা বাস্ স্ট্যাণ্ড্-এ ফিরে চললো।

বোট্ জেটির কাছে পৌঁছতেই চোখে পড়লো একটা মোটর লঞ্চ্ জেটি ছেড়ে রওনা হচ্ছে ভাইপিন্-এর দিকে।

: আমরা যাবোনা দাদা? শেফালি চঞ্চল হয়ে উঠলো।

: ওখানে তেমন কিছুই দেখবার নেই বোনটি। —বললেন শেখরদা।

বাস্-এর অপেক্ষায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হলো। দু'খানা বাস্ অবশ্য ইতিমধ্যে এলো গেলো, কিন্তু কোনটাই মট্টাকেরির নয়। তৃতীয় বাস্খানা এলো মট্টাকেরির। উঠে পড়লো অতনুরা।

মট্টাকেরির মুখ্য দ্রষ্টব্য ডাচ্ প্যালেস্ থেকে কিছুটা আগের একটা স্টপেজ্-এ নামলো সকলে। হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে পৌঁছলো পথের ডানদিকে, একটা উন্মুক্ত ফটকের সামনে। ভিতরে দেখা যাচ্ছে খোলা মাঠ। ফটক দু'তে শুরু হওয়া পথটা ধরে মাঠের ওপর দিয়ে খানিকটা গিয়ে বাঁ-কোণের বাড়ীটার দরজায়।

এক সারি সিঁড়ি উঠে গেছে নীচের পথ থেকে বাড়ীর দু'তলায়।

অতনুরা উঠে গেলো সিঁড়ি বেয়ে।

প্রথম ঘরটা পেরিয়ে একটা হল-ঘর। তার ভিতর দিয়ে গেলে আর একটা লম্বা ঘর, যার সারা দেওয়ালে রামায়ণের নানা উপাখ্যানের রঙীন চিত্রণ রেখার স্পষ্টতায় ও রঙের গভীরতায় ছবিগুলি উজ্জ্বল হল-ঘরটিতে ও তার পাশের ঘরে কোচ্চির রাজ-পরিবারের ব্যবহৃত নানা সামগ্রী মায় পালকির প্রদর্শনী। তার পরের কক্ষটিতে এবং নীচের একটি প্রকোষ্ঠের দেওয়ালেও বর্ণাঢ্য পৌরাণিক চিত্রাবলী।

এই চিত্রসম্ভারের জন্যই ডাচ্ পালেস্-এর প্রসিদ্ধি। তা' ছাড়া এখানেই অনুষ্ঠিত হতো কোচ্চি রাজগণের অভিষেক।

ছবি দেখা শেষ করে বেরিয়ে আসতে আসতে শেখরদা বললেন : এই প্রাসাদটার নাম কেমন করে যে ডাচ্ পালেস্ হয়ে গেছে তা' দুর্বোধ্য! ১৫৫০ সালে উচ্চপদস্থ এক পোর্তুগীজ রাজ কর্মচারীর হঠকারিতায় মট্টাঞ্চেরির একটি মন্দির লুণ্ঠিত হলে কোচ্চি-রাজ পোর্তুগীজদের ওপর রুষ্ট হ'ন। পোর্তুগীজরা তাঁকে সন্তুষ্ট করবার জন্য এই সচিত্র প্রাসাদটি তৈরি করে উপহার দেয়। এ হলো খুব সম্ভবতঃ ১৫১৫ সালের ব্যাপার। ডাচ্রা পরবর্তী-

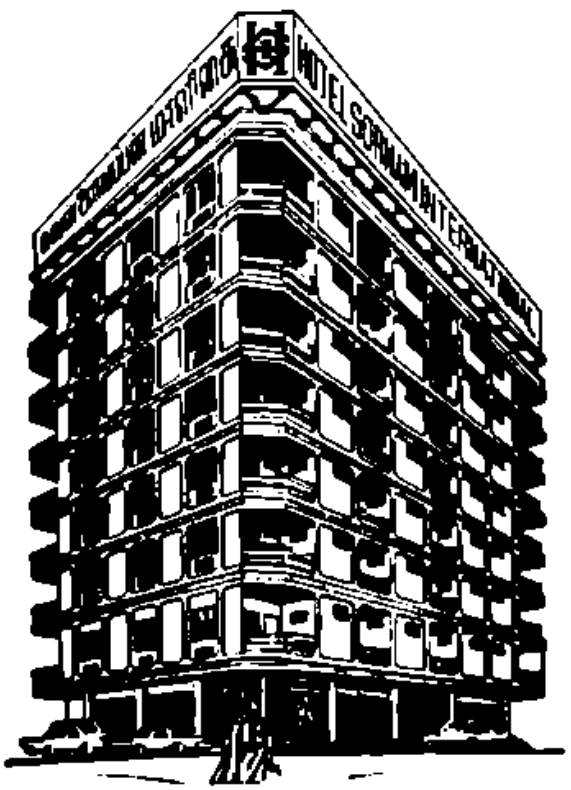

Gram : SORNATEL
Phone : 38061 (6 Lines)

Tourists !

A MINUTE'S WALK FROM
MADRAS CENTRAL STATION

hotel sornam international

(VEGETARIAN)
10, Stringer Street, Park Town,
MADRAS-600 003

A hotel of Star Styled Comforts

★ All rooms bath attached and well furnished
★ Hot & Cold Water ★ Telephone
★ Money Changing Counter ★ Travel Counter
★ Roof top dining ★ Music Channel
★ Peep out Balcony ★ Moderate rates.

কালে প্রাসাদটির সংস্কার সাধনই শুধু করেছিল, অথচ তারই ফলে এর ডাকনাম হয়ে গেছে—ডাচ্ প্যালেস্!

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে একটি ইমারতের চূড়া দেখে অমিয় জিজ্ঞেস করলো : ওটা কি দাদা?

: ওটি এখানের Jew Synagogue।

: এই প্যালেস্-এর পাঁচিলের গায়েই মনে হচ্ছে?

: হ্যাঁ। কিন্তু ওখানে যেতে হ'বে বেশ খানিকটা ঘুরে।

ডাচ্ প্যালেস্-এ যে পথে এসেছিল সেই পথ ধরে আরও কিছুটা সামনে এগিয়ে ডান-হাতি পথটায় চললো সবাই। আবার ডানদিকে বাঁক নিয়ে ওরা গিয়ে পড়লো মট্টাকেরির কেরি-ঘাটের কাছে।

: এইবার একটা গলি দিয়ে যেতে হ'বে আমাদের ইহুদী সিনাগগ্-এ। কিন্তু কোন গলিটা মনে করতে পারছিনা যে!—থমকে দাঁড়িয়ে বললেন শেখরদা। অবশেষে এক ভদ্রলোকের শরণাপন্ন হলেন। রাস্তার ধারে একটা বাড়ীর ছায়ায় দাঁড়িয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন তিনি।

: আপনারা কোথা হ'তে এসেছেন?—জানতে চাইলেন ভদ্রলোক।

: কলকাতা থেকে।

: চলুন, দেখিয়ে দি' সিনাগগ্।—বলে ওদের সঙ্গে চললেন ভদ্রলোক।

পথ চলতে চলতে পরিচয় দেওয়া-নেওয়ার অমিয়রা জানতে পারলো ওঁর নাম মিস্টার কার্লস। উনি রোম্যান্ ক্যাথলিক।

ইহুদী সিনাগগ অর্থাৎ ধর্ম-মন্দিরটির তত্ত্বাবধায়ক

Pipes, Tubes and fittings of
all descriptions

BENGAL TUBES

Specialists in :
Pneumatic & Boiler Tubes

5 1 CLIVE ROW, CALCUTTA-700001

Phone : 23-3283 Gram : TUBEXPERTS

মিস্টার কোহেন ওঁর বিশেষ পরিচিত। তাই ওঁর সঙ্গে আসতে দেখে অমিয়দের সসম্ভ্রমে আহ্বান জানালেন। ঘুরেঘুরে প্রার্থনা কক্ষের সব কিছু দেখালেন। সুন্দর কারুকার্যখচিত তিনটি আধারের একটি থেকে বের করে আনলেন সুপ্রাচীন এক 'ওল্ড টেস্টামেন্ট'। গোল করে পাকানো পুঁথিটির খানিকটা খুলে দেখিয়ে বললেন : See this is sacredly written on cow's skin।

ঝাড়-লণ্ঠন, সোনালি রঙের নানা অলঙ্করণ ও পাঠ-মঞ্চ শোভিত প্রার্থনা কক্ষটি দেখে বাইরের উঠানে গেলো অমিয়রা। সেখানে রয়েছে হিব্রুলিপি পূর্ণ ছোটবড় অজস্র পাথরের টুকরো।

সিনাগগ্ থেকে ফিরবার পথে অতনু বললো : কলকাতায়ও ইহুদীদের সিনাগগ্ আছে, তাই না?

: আছে, তবে কলকাতার ইহুদীরা মালাবারের

তুলনায় মাত্র সেদিনের। এঁরা প্রথমে এসেছিলেন কোট্টঙ্গল্‌র্-এ, তারপর কোচ্চির এই মট্টাঞ্চেরি পল্লীতে। একসময়ে এঁরা সংখ্যায় এত বেশি ছিলেন যে, এঁদের নিজেদের একজন স্বতন্ত্র শাসন-কর্তা পর্যন্ত ছিলেন।— শেখরদা বললেন।

সত্যই এ এক অবিসংবাদিত তথ্য যে, খৃস্টীয় পঞ্চম হ'তে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত কোট্টঙ্গল্‌র্-এ ইহুদীদের নিজস্ব একজন শাসক ছিলেন এবং তাঁদের রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য ছিল। নিজেদের ছোট পত্তনিটির নামকরণ করেছিলেন তাঁরা,—শিঙলী। দেশ দেশান্তরে ইহুদীদের সেই ভারতীয় পত্তনিটির নাম ছড়িয়ে পড়েছিল। চতুর্দশ শতাব্দীতে হিব্রু কবি রব্বি নিসিম লিখেছিলেন—

'আমি স্পেন থেকে গিয়েছিলাম
আমার বহুশ্রুত শিঙলীতে,
যেখানে আমার দীর্ঘ ধ্যানের ধন
এক ইস্রায়েলি নৃপতিকে
দেখে এলাম নিজের চোখে।'

ইহুদীরা যে কবে প্রথম এদেশে বসতি করেছিলেন তা' নিয়ে মতদ্বৈধ থাকলেও, অনেকেরই মতে, রাজা সলোমনের একটি বাণিজ্য-তরীর কয়েকজন থেকে গিয়েছিলেন কোট্টঙ্গল্‌র্-এ। পরে পঞ্চম শতাব্দীতে পারস্য হতে পালিয়ে বহু ইহুদী এসে যোগ দেন তাঁদের সঙ্গে।

অপর একটি মতে: Shalamanezer নামে জনৈক ইহুদী সেনাপতি কর্তৃক ধৃত একদল ইহুদী বন্দী মুক্তি পেয়ে কোট্টঙ্গল্‌র্-এ এসে বসবাস শুরু করলে শিঙলীর ইহুদী পত্তনির সূচনা হয়।

১৬৮৬ খৃস্টাব্দে কোচ্চিতে আগত ওলন্দাজ-ইহুদী Moses de Paiva তাঁর Noticas dos Judeos de Cochin গ্রন্থে লিখে গেছেন—'Titus Vespasimus কর্তৃক ধৃত ও নির্বাসিত ইহুদীদের সত্তর, আশী হাজার বংশধর Myora থেকে ৩৭০ খৃস্টাব্দে মালাবার উপকূলে এসে বসতি স্থাপন করেন।'

কোচ্চির ইহুদীদের মধ্যে প্রচলিত মতে—'Soon after the destruction of the second Temple in the 1st. century, ten thousand Jews were graciously received by the Hindu Rular and were allowed to settle in different parts of the country, of which the majority made their homes in cranganore।'

পণ্ডিতদের কিছুকিছু মত-পার্থক্য থাকলেও খৃস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কোট্টঙ্গল্‌র্-এ যে ইহুদীদের অস্তিত্ব ছিল তার কয়েকটি প্রমাণ বা নির্ভরযোগ্য সূত্র আছে।

বংশ পরম্পরায় চলে আসা একটি অতি প্রাচীন উদ্‌বাহ-গীতিতে Habban নামে এক ব্যক্তি ও তার কার্যকলাপের উক্তি পাওয়া যায়। Habbanকে কোট্টঙ্গল্‌র্ হ'তে প্যালেস্টাইন-এ পাঠানো হয়েছিল একজন মিস্ত্রি আনতে এমন মিস্ত্রি যে নাকি প্যালেস্টাইন-এ রাজা সলোমনের যে বিখ্যাত জুডা-মন্দির ছিল তার চেয়েও সুন্দর মন্দির তৈরি করতে পারবে।

Habban ফিরে এসেছিল যাঁকে নিয়ে, তিনিই ভারতে প্রথম শতাব্দীতে আগত যীশুখৃস্টের শিষ্য ও প্রচারক St Thomas। St. Thomas কোট্টঙ্গল্‌র্-এর ইহুদী বসতিতে বেশ কিছুকাল বাস

করেন এবং চল্লিশজন ইহুদীকে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করেন। খৃস্টীয় দ্বিতীয় শতকে একটি রোমক জাহাজ লোহিত সাগরের তীরে অবস্থিত Myes Hormes, আরব দেশ ও মালাবারের মধ্যে নিয়মিত যাতায়াত করতো। সেই জাহাজের নাবিকরা কোট্টয়ম্-এ একটি ইহুদী বসতি দেখেছিল।

খৃস্টীয় তৃতীয় হ'তে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে রচিত Babylonian Talmud গ্রন্থে Rabbi Judah নামে হিন্দু হ'তে জুডা ধর্মে দীক্ষিত এক ইহুদীর নাম উল্লিখিত হয়েছে।

Joseph Rabban নামে একজনকে ইহুদীদের রাজপ্রমুখ করে কোট্টয়ম্-এর আঞ্জুবনং অঞ্চলের পত্তনি দান বিষয়ে, কেরল রাজ প্রদত্ত অনেকগুলি সুপ্রাচীন তাম্রশাসন বা তাম্রফলকে লেখা দলিল পাওয়া গেছে। ফলকগুলির বিষয়বস্তু অধুনা অপ্রচলিত ভট্টেড়ুত্তু নামক প্রাচীন তমিড় লিপিতে লিখিত। ইহুদীদের বিশ্বাস ওগুলি ৩৭৯ খৃস্টাব্দের।

ভারতবর্ষে ইহুদীদের অস্তিত্বের কথা প্রথম প্রকাশ পায় Anquitil Du Peron-এর Zend Avesta গ্রন্থে। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঘটেছিল এক ধনী ইহুদীর যিনি Peronকে জানান যে, তাঁর নিজ সম্প্রদায়ের এক বিরাট বসতি আছে মালাবারে।

স্পেন ও অন্যান্য ইউরোপীয় রাজ্য হ'তে আগত ইহুদীদের নিয়ে গঠিত কোট্টয়ম্-এর ইহুদী বসতি হাজার বছর ধরে ক্রমোন্নতি অব্যাহত রাখে।

Joseph Rabban-এর বংশ লোপ পেলে আঞ্জুবনম্-এর উত্তরাধিকার দাবীকারী দুই ভাই ও তাঁদের অনুগামীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয় এবং প্রচণ্ড সংঘর্ষ ঘটে। তার অল্পকাল পরে, ইহুদীরা তাদের গোল মরিচের রপ্তানি বাণিজ্যে বাধা সৃষ্টি করছে এই অভিযোগে স্থানীয় মুসলমানরা ইহুদীদের সঙ্গে দাঙ্গা বাধায় এবং ইহুদীদের বসতি উপাসনাগার ইত্যাদি ভস্মীভূত করে ফেলে। যে সব ইহুদী প্রাণে বেঁচে যান তাঁরা তাঁদের প্রাচীন বসতি ছেড়ে কোচ্চিতে এসে বসতি স্থাপন করেন।

কোচ্চিরাজের সহৃদয়তায় মট্টাঞ্চেরিতে ১৫৬৭ সালে জু টাউন এবং ১৫৬৮ খৃস্টাব্দে স্থাপিত হয় জু সিনাগগ্। পোর্তুগীজদের কেরল আসার পর হ'তে এবং তাদের একশ' ষাট বছরের আধিপত্যকালে কোচ্চির ইহুদীদের নিদারুণ লাঞ্ছনা ও নিগ্রহ ভোগ করতে হয়েছিল। পোর্তুগীজরা ভুলে গিয়েছিল যে তাদের ভারতবর্ষে আসার পথ খুঁজে বের করতে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছিলেন ইহুদী জ্যোতির্বিদ, ইহুদী পর্যটক এবং ইহুদী দো-ভাষীরাই।

কোট্টয়ম্-এর পরিত্যক্ত ইহুদী বসতিটি পোর্তুগীজরা একেবারে ধূলিসাৎ করে দেয় এবং কোচ্চির জু টাউনটির বাড়ীঘর ও সিনাগগ্টি ধ্বংস করে ফেলে। ইহুদীদের প্রাচীন পুঁথি-পত্রাদির সব কিছুই তাদের লুঠতরাজের ফলে বিনষ্ট হয়ে যায়। কোচ্চি-রাজ ইহুদীদের অনুগ্রহ করতেন বলে তাঁর উপরেও পোর্তুগীজদের প্রচণ্ড আক্রোশ ছিল। পোর্তুগীজ লেখকদের অনেকে তাঁকে 'ইহুদীদের রাজা' বলে গেছেন।

১৬৬১ খৃস্টাব্দে ওলন্দাজরা কোচ্চিতে আবির্ভূত হলে স্থানীয় ইহুদীরা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন কিন্তু ওলন্দাজরা সিংহলে চলে যায়। ফলে, পোর্তুগীজদের হাতে ইহুদীদের, চরম নির্য্যাতন ও রক্তপাত ঘটে।

১৬৬৩ খৃস্টাব্দে ওলন্দাজদের পুনরাবির্ভাব ঘটে

ও তারা কোচ্চি থেকে পোর্তুগীজদের বিতাড়িত করে। পোর্তুগীজদের ভয়ে এখানে ওখানে ছড়িয়ে পড়া, বাস্তু-হারা ইহুদীরা, ক্রমে ক্রমে ফিরে আসতে থাকেন। প্রটেস্টান্ট, ওলন্দাজদের একশ' বত্রিশ বছরের আধিপত্যকালে কোচ্চির ইহুদীরা আবার সুসমৃদ্ধ হয়ে ওঠেন।

কোচ্চিতে ইহুদীদের অস্তিত্বের কথা জানতে পেরে আমস্টডাম্-এর ইহুদীরা ১৬৬৮ খৃস্টাব্দে Moses Peryade Paiva-র নেতৃত্বে একটি দল পাঠান মালাবারে। পাইভার রিপোর্টটিকে কোচ্চির ইহুদীদের বিষয়ে প্রথম ঐতিহাসিক দলিল বলা যায়।

১৭৯৫ খৃস্টাব্দে এই অঞ্চলে ইংরেজ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহুদীরা ইংরেজদের রাজত্বকালে সুখে শান্তিতে বাস করেন। ১৯৪৭ সালে ইস্রায়েল রাষ্ট্রের সৃষ্টি হলে দলেদলে ইহুদী তাঁদের পিতৃ-পুরুষের আদি বাসভূমিতে চলে যান।

বিদেশী ইহুদীরা ভারতের সঙ্গে শুধু বাণিজ্য করেই ফিরে যাননি, তাঁরা এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করেছিলেন এবং তাঁরাই একমাত্র বিদেশী যাঁরা শান্তিপূর্ণভাবে প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন ভারতবর্ষে। খৃস্টীয় প্রথম শতাব্দী হ'তে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত তাঁদের এদেশে অবস্থান প্রসঙ্গে জনৈক ইহুদী লেখক S. S. Koder বলেছেন,—The Jews were the first aliens to settle in India and it was as a result of the genorosity and tolerance shown to the Jews by successive Hindu rulers of Sothern India, that India first earned the name as the land of tolerance and under standing of all religions.

হিন্দুর এই পরমত সহিষ্ণুতা ও অনাগ্রাসী আচরণই তার ধর্মকে জগতের শ্রেষ্ঠতম ধর্মমতে পরিণত করার অন্যতম রহস্য।

কোডার আরও লিখেছেন—Menasseh ben Israel added weight to his petition to Oliver Cromwell in 1655, for the resettlement of the Jews in England from where they were expelled in 1290, by referring to the happiness and tolerance enjoyed by the Jews of Cochin under a Hindu ruler.

পৃথিবীর অন্যান্য প্রধান ধর্মমতগুলিতে ধর্মান্তরিত করার প্রথা আছে, কিন্তু হিন্দুর তা নেই। হিন্দু তার নিজ ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য কখনও অপরকে ধর্মান্তরিত করার পন্থা গ্রহণ করেনি।

(ক্রমশঃ)

বিভাগীয় সম্পাদক

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

থাকার ব্যবস্থা। প্রসিদ্ধি কি জন্য। দ্র: দ্রষ্টব্য।

৭২। কোড়িকোট ॥ Calicut

(ক) হাওড়া হ'তে রেলপথে মাদ্রাজ সেণ্ট্রাল এবং সেখান থেকে ম্যাঙ্গালোর-এর পথে কোড়িকোট (কালিকট)

(খ) আর্য-ভবন, মডার্ন হিন্দু হোটেল, কেরল ভবন, শ্রীহরি লজ ইত্যাদি।

(গ) ঐতিহাসিক শহর,—বিখ্যাত সামুদ্রিন্ রাজগণের নিবাস।

(ঘ) সাগর-সৈকত,—১৮ কি. মি. দূরবর্তী কল্লট, যেখানে ভাস্কো-দা-গামা পদার্পণ করেছিল ভারতের মাটিতে এবং কি. মি. দূরের তিরুবলয়নাড়ু দেবস্থান।

৭৩॥ কুর্টালাম্ ॥ Courtalam

(ক) হাওড়া থেকে মাদ্রাজ সেণ্ট্রাল। মাদ্রাজ এগমোর হ'তে মাদ্রাজ – বিরুধনগর—কুইলন্ – ত্রিবেন্দ্রমের পথে তেঙ্কাশী। তেঙ্কাশী হ'তে বাস্-এ বিশ মিনিটের পথ কুর্টালাম্।

অথবা, মাদ্রাজ হ'তে তিরুনেল্‌বেলি। সেখান থেকে কুর্টালাম্ ৫৬ কি. মি. বাস্-এ যেতে হয়।

(খ) তিরুনেল্‌বেলি বা তেঙ্কাশীতে থাকার ব্যবস্থা করলে ভাল হয়। তিরুনেল্‌বেলিতে অনেকগুলি লজ আছে। নেল্‌লায়ি লজ একটি চমৎকার লজ। তেঙ্কাশীতে লজ এবং রেলওয়ে ক্যাম্পিঙ কোচ্ আছে।

(গ) প্রাকৃতিক মনোহারিত্বের জন্য।

(ঘ) একাধিক নির্ঝরের জন্য।

৭৪॥ কোল্‌হাপুর ॥ Kolhapur

(ক) হাওড়া হ'তে বোম্বাই ভি. টি.। সেখান হ'তে রেলপথে সরাসরি কোল্‌হাপুর।

(খ) সহ্যাদ্রি হোটেল, বাস্-স্ট্যাণ্ড। হোটেল ওপাল্, ব্যাঙ্গালোর-পুণে হাইওয়ে। টুরিস্ট হোটেল, স্টেশন রোড। রাজহংস লজ, বিন্দু চক্। রেন্‌বো বোর্ডিঙ অ্যাণ্ড লজিঙ, তারাবাঈ পার্ক। ফড়্‌কে গেস্ট্ হাউস, রবিবার পেথ ইত্যাদি।

(গ) তীর্থস্থান তথা ঐতিহাসিক নগরী।

(ঘ) খৃস্টীয় নবম শতাব্দীতে নির্মিত শ্রীমহালক্ষ্মী মন্দির। ভারতের আদি তথা শিল্পশাস্ত্রে উল্লিখিত একমাত্র মহালক্ষ্মী মন্দির।

৭৫॥ কোল্লং। Quilon

(ক) হাওড়া হ'তে মাদ্রাজ এবং সেখান থেকে তিরুঅনন্তপুরমের পথে কোল্লং (কুইলন্)।

(খ) রেল স্টেশনের সামনেই হরিনিবাস। অনতিদূরে ঘড়িঘরের কাছে আর্য-ভবন, পূর্ণপ্রকাশ ও ক্যাসিনো লজ্। মেন্ রোডে গুরুপ্রসাদ লজ্।

(গ) প্রাকৃতিক মনোহারিত্বের জন্য প্রসিদ্ধ।

(ঘ) সাগর সৈকত, ডেঙ্গশেরি বা তাঙ্গাচেরি ও নীন্টকর।

৭৬॥ কোওঅলং॥ Kovalm

(ক) হাওড়া হ'তে মাদ্রাজ সেন্ট্রাল ও সেখান থেকে তিরুঅনন্তপুরম্। তিরুঅনন্তপুরম্ থেকে বাস্-এ কোওঅলং ১৬ কি. মি.।

(খ) তিরুঅনন্তপুরম্ থেকে সদ্য দিনে বেড়িয়ে আসা যায়। ওখানে বহু সংখ্যক হোটেল ও লজিঙ্ হাউস আছে। কোওঅলং-এ আছে কোওঅলং প্যালেস হোটেল এবং কোওঅলং গ্রোভ।

(গ) সাগর সৈকতের জন্য।

(ঘ) সৈকত।

(ক্রমশঃ)

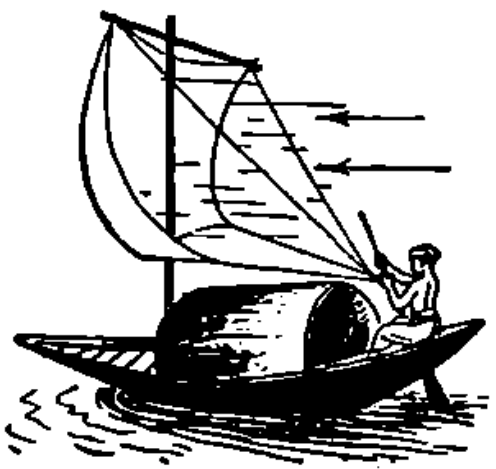

ভারতের মন্দির

বিশেষ প্রতিনিধি
শ্রী শংকরনারায়ণ

মন্দির ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম-জীবনের পরিচয়, পরম-চিন্তার অভিজ্ঞান,—ইতিহাসের উপাদান।

মন্দিরকে স্বীয় পরমাশক্তির অধিষ্ঠান-দান জ্ঞানে প্রবল-প্রতাপ রাজশক্তিকে পরম উপেক্ষা করতে,—মন্দিরের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হতে।

রাজরাজেশ্বরের বিজয়স্তম্ভাদি অপেক্ষা দেবায়তনকে এদেশের অধিবাসীরা দিয়েছেন অধিকতর মূল্য, প্রাধান্য ও মহত্ত্ব। তাই দেখা যায় রাজা গেছেন, তাঁর রাজপ্রাসাদ, রাজধানী যায় রাজ্যও লুপ্ত হয়ে গেছে,—দুর্ধর্ষ রাজশক্তি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে কালগর্ভে,—রাজরাজ চক্রবর্তীর নাম তলিয়ে গেছে বিস্মৃতির অতল তলে তাঁরই সঙ্গে। কিন্তু যদি সেই রাজার কৃত দেবালয় থাকে তাহলে তাঁর নামের এখনও সমাধি ঘটেনি। জনসাধারণ বাঁচিয়ে রেখেছেন তাঁর রচিত মন্দিরটিকে ধূপ-ধুনোয় ভরে, আর তারই ফলে বেঁচে আছে রাজার স্মৃতি, রাজার নাম। মন্দির দিয়েছে তাঁর স্মৃতিকে অমরত্ব।

হায়দ্রাবাদ থেকে মনমাড-গামী ট্রেন-এ নানদেড়। শিখগুরু গোবিন্দ সিংজীর নির্বাণস্থল বিধায় স্থানটি শিখদের এক মহাতীর্থ। ঐ নানদেড় হ'তে ৬৪ কিলোমিটার দূরে মরাঠওআদা বা দক্ষিণ-মহারাষ্ট্রের বিখ্যাত দেবস্থান,—ঔন্ধা-নাগনাথ। স্থানটির নাম ঔন্ধা, দেবতার,—নাগনাথ।

দেবগিরির অর্থাৎ বর্তমান দৌলতাবাদের যাদব রাজগণ কর্তৃক নাগনাথের মন্দিরটি খৃস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছিল।

কৃষ্ণ-শিলায় রচিত মন্দিরটির ঊর্ধাংশ খৃস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়েছিল। বর্তমানে যা শোভা পাচ্ছে তা' রাণী অহল্যাবাঈ নির্মিত।

প্রাকারবেষ্টিত বিশাল এক অঙ্গনের মাঝে মন্দিরটি অবস্থিত। পুরোভাগে নন্দী-মণ্ডপ।

মন্দিরটিকে ঘিরে অঙ্গনে রয়েছে ছোটছোট অনেকগুলি মন্দির। সেগুলিতে অবস্থান করছেন,—ঘৃষ্ণেশ্বর, কাশী-বিশ্বনাথ, মল্লিকার্জুন,—নৃ-সিংহ ইত্যাদি।

মন্দিরটির তিনটি প্রবেশদ্বার, উত্তরে, পূর্বে ও দক্ষিণে নন্দী-মণ্ডপমুখী দ্বারটিই মুখ্য বা মহাদ্বার। ঐ দ্বারপথে প্রবেশ করলেই দক্ষিণে বিনায়ক ও বামে গৌরী-পীঠসহ শিবলিঙ্গ। মণ্ডপের ভূমিতে

রয়েছেন কূর্মমূর্তি, যা মহারাষ্ট্রে বহু মন্দিরে দেখা যায়।

মণ্ডপের প্রান্তভাগে গর্ভগৃহ। তবে কক্ষটিকে গর্ভ-গৃহ না বলে অন্তরাল বলাই শ্রেয় কারণ, ঐ কক্ষটির মধ্য দিয়ে সিঁড়িপথ ধরে ভূগর্ভস্থ প্রকোষ্ঠে নামলে তবেই পৌঁছনো যায় মন্দিরের অধিষ্ঠাতা নাগনাথের সন্নিধানে। উত্তর-পশ্চিম ভারতের বহু অঞ্চলেই এরূপ ভূগর্ভস্থ কক্ষে দেখা যায় মূল বিগ্রহের অধিষ্ঠান।

যাই হোক, মণ্ডপে ঐ ভূগর্ভগামী সোপানের কাছেই রয়েছেন অপূর্ব দর্শন এক বিষ্ণু। দক্ষিণ ঊর্ধ্ব হস্তে শঙ্খ, নিম্ন হস্ত দান মুদ্রার ভঙ্গীতে বিন্যস্ত কিন্তু মনে হয়ে অস্ত্র ধৃত ছিল,—বাম ঊর্ধ হস্তে চক্র ও নিম্নে গদা। নিঃসন্দেহে ইনি কেশব। সম-দ্বিপদ ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান। প্রভাবলীতে দশাবতারের মূর্তি খোদিত।

মূর্তিটি নৃ-সিংহ তীর্থ নামে অদূরবর্তী এক জলাশয় থেকে পাওয়া গেছে।

ঐ মূর্তিটির ডান-হাতি আর একটি বিষ্ণু প্রতিমা বিরাজমান। মূর্তিটি অনন্তসুন্দর কিন্তু ক্ষুটিত। অওরংগজেবের আক্রমণকালে বিধ্বস্ত হয়েছে।

মন্দিরগাত্রের অসাধারণ কারুকৃতির অধিকাংশই উপরোক্ত কালেই বিনাশ লাভ করেছে। সামান্য যা অক্ষত আছে তার মধ্যে জগতীতে রয়েছে অশ্ব, গজ এবং যোদ্ধাদির সারিবদ্ধ মূর্তি। তার উপরিভাগে পঙ্‌ক্তিবদ্ধ নানা দেবদেবীর ক্ষুদ্রাকার মূর্তি। তদুপরি কিছুটা বৃহদাকার মূর্তিগুলির মধ্যে শিবেরই নানা লীলামূর্তি। দক্ষিণ গাত্রে আছেন এক অতি সুন্দর গজহা মূর্তি।

ঔন্ধার এই শিবালয়ের শিব মূর্তিগুলির উল্লেখ-যোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, মূর্তিগুলির অধিকাংশই খট্টাঙ্গধারী।

দক্ষিণ বহির্গাত্রে তুষ্টি ও পুষ্টি পত্নীদ্বয় সহ দণ্ডায়মান বিনায়ক। উত্তরগাত্রের উল্লেখযোগ্য প্রতিমা,—গরুড়ারোহী লক্ষ্মী-নারায়ণ। দক্ষিণ-পশ্চিমে আছেন অষ্টাদশভুজ মহেশ এবং উত্তর-পশ্চিমে বৃষ, সিংহ ও গণ-সহিত উমা-মহেশ্বর।

স্থানীয় অধিবাসীরা ও নাগনাথ মন্দিরের পুরোহিতগণ নাগনাথকে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম জ্যোতির্লিঙ্গরূপে দাবী করেন। কিন্তু ঐ দাবী সমর্থন করা যায়না। কারণ,—

১) দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ বর্ণনে সুস্পষ্টরূপে বিবৃত হয়েছে—'নাগেশং দারুকাবনে।' ঔন্ধার দেবতা নাগেশ (নাগেশ্বর) ন'ন, নাগনাথ।

২) উক্ত শ্লোকে দেবতার স্থান নির্দেশিত হয়েছে দারুকাবন। আলোচ্য দেবতার স্থান ঔন্ধা যার প্রাচীন নাম অমর্দক।

৩) শ্রীকৃষ্ণের সখা দারুক এর নাম হ'তে দ্বারকার সন্নিহিত এক অঞ্চলকে দারুকাবন বলা হয় এবং সেখানে রয়েছেন নাগেশ্বর। দারুক গুজরাটের সমুদ্রকূলবর্তী অঞ্চলবাসী। তাঁর নামাঙ্কিত অঞ্চল দারুকাবনকে দক্ষিণ মহারাষ্ট্রের এই অঞ্চলে চিহ্নিত করণের চেষ্টা অর্থহীন।

ভারতীয় শাস্ত্রাবলী

— শ্রী সত্যার্থী

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

বেদ।

সংস্কৃতভাষায় প্রণীত শাস্ত্রগ্রন্থাদির প্রসঙ্গে প্রথমে বেদের আলোচনা কর্তব্য। অবশ্য আলোচনা না বলে পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা বলাই সঙ্গত।

বিদ্ + অল্ = বেদ। বেদের অর্থ জানা বা জ্ঞান।

বেদের অপর আখ্যা,—শ্রুতি। 'শ্রু' ধাতু হ'তে শ্রুতি। শ্রু-র অর্থ,—শোনা। ঋষিগণ কর্তৃক আত্মা বা পরমাত্মা হ'তে ঐ জ্ঞান শ্রুত হয়েছিল এই বিবেচনাতেই বেদকে শ্রুতি বলা হয়েছে, এবং উক্ত কারণেই বেদকে চিহ্নিত করা হয়েছে অপৌরুষের রূপে। কোনও পুরুষই অর্থাৎ মনুষ্যই বেদকর্তা অর্থাৎ বেদ রচয়িতা রূপে বিবেচিত হ'তে পারেন না। পরমাত্মা হ'তেই বেদ নিঃসৃত।

বেদ আদিতে ছিল এক ও অভিন্ন। প্রয়োজন-বশতঃ বেদকে দ্বাপরান্তে মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন চার ভাগে বিভক্ত করে সংকলিত করেছিলেন। (তাই তাঁর নাম হয়েছিল বেদ-ব্যাস।)

ঐ চারটি বেদ—

ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ব বেদ।

প্রসঙ্গতঃ বলা প্রয়োজন বেদ-ত্রয়ী নামে একটি কথা প্রচলিত আছে যা অনেকের মনে বিভ্রান্তি ঘটায়। তাঁরা ঋক্-সাম-যজুকেই বেদ-ত্রয়ী মনে করেন এবং অথর্ব বেদকে উত্তরকালীন সংযোজন ভাবেন। (Originally there were only three Vedas; but a fourth, the Atharva Veda was subsequently added to them.—V. S. Apte : SANSKRIT—ENGLISH DICTIONARY) বেদ-ত্রয়ীর অর্থ কিন্তু ভিন্ন। শব্দটির অর্থ,—ত্রিকাণ্ডক বেদ। বেদে জ্ঞান, কর্ম ও উপাসনা এই তিন বিষয়ের বর্ণন আছে। বেদ চতুষ্টয়ের মন্ত্রগুলিতে উক্ত বিষয় তিনটির কোন না কোনটির প্রতিপাদন হয়েছে এবং সেই কারণেই বেদ 'ত্রয়ী' আখ্যা লাভ করেছে।

ব্যাসদেব যজ্ঞার্থে বেদকে চারভাগে বিভক্ত করেছিলেন। যজ্ঞের মুখ্য কার্য-কর্তা চারটি,—

১) হোতা, ২) অধ্বর্যু, ৩) উদ্গাতা, ৪) ব্রহ্মা।

এঁদের মধ্যে হোতার কার্যোদ্দেশে সংগৃহীত মন্ত্রগুলি,—ঋগ্বেদ। অধ্বর্যুর কার্যোদ্দিষ্ট মন্ত্রসমূদয়, —যজুর্বেদ। উদ্গাতার জন্য উদ্দিষ্টগুলি,—সামবেদ এবং ব্রহ্মার কার্যের জন্য,—অথর্ব বেদ।

যে মন্ত্রগুলি উক্ত হোতাদি একাধিক কর্তার কার্যোপযোগী সেগুলি অপরের বেদেও স্থানলাভ করেছে। তাই সামবেদের বহু মন্ত্র ঋগ্বেদে এবং কিছু কিছু অথর্ব বেদেও সন্নিবেশিত দেখা যায়।

বেদমন্ত্র ।

প্রতিটি বেদমন্ত্রের সঙ্গে চারটি বিষয় জড়িত। সেগুলি,—

১) ঋষি : বেদমন্ত্র একপ্রকার সূত্রস্বরূপ। বৈদিক পরিভাষা নিরুক্তের সাহায্যেও যার সম্পূর্ণ অর্থবোধ বা অর্থনিরূপণ সম্ভব নয়। যে ঋষির অন্তরে যে মন্ত্রের উদ্ভব হয়েছিল তাঁকে সেই মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষি বলা হয়। মাত্র সেই ঋষির স্বীয় রচনাতেই তদীয় মন্ত্রের যাথার্থ্য উপলব্ধ্য।

২) দেবতা : যদি উক্ত ঋষির রচনা নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে তো সংশ্লিষ্ট মন্ত্রের দেবতার ধ্যান করতে করতে সমাধিস্থ অবস্থায় মন্ত্রটির মর্ম উপলব্ধি ঘটতে পারে। যেমন,—গায়ত্রী মন্ত্র। আদিতে বশিষ্ঠই ছিলেন ঐ মন্ত্রের ঋষি। পরবর্তীকালে সবিতার ধ্যান মাধ্যমে গায়ত্রীমন্ত্রের ঋষিত্ব লাভ করেছিলেন বিশ্বামিত্র।

৩) ছন্দ : মন্ত্র পাঠে উচ্চারণ কিরূপে করতে হবে ছন্দ তারই সহায়ক।

৪) বিনিয়োগ : যা হতে জানা যায় মন্ত্র কি কাজে লাগবে।

বেদপাঠ :

বৈদিক মন্ত্রাদির সঠিক ও শুদ্ধ পাঠ আবশ্যক। অশুদ্ধ ও ত্রুটিপূর্ণ পাঠে পাঠকর্তার অনিষ্ট হয় বলে বিশ্বাস প্রচলিত। (মনে হয় ত্রুটিপূর্ণ পাঠ ও তা' হ'তে মন্ত্রাদির অপভ্রংশে সৃষ্ট হওয়ার আশঙ্কাকে নিবারিত করার উদ্দেশ্যই ঐ অনিষ্টের ভীতি প্রদর্শন।)

ত্রুটি নিবারণের উদ্দেশ্যে বেদপাঠের অষ্টরীতি আছে। সেগুলি,—১) ক্রমপাঠ, ২) ঘনপাঠ, ৩) রেখাপাঠ, ৪) জটাপাঠ, ৫) ধ্বজপাঠ, ৬) মালাপাঠ, ৭) দণ্ডপাঠ ও ৮) রথপাঠ।

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

পত্রিকার মূল্য

প্রতি সংখ্যা	১০ প.
বিশেষ সংখ্যা ফাল্গুন	১'২৫ প.
শারদ সংখ্যা	৫'০০ টা.

বাৎসরিক—সডাক
(বিশেষ ও শারদ
সংখ্যা সহ)

ডাকযোগে টাকা পাঠাবার ঠিকানা

যান্ত্রিক পরিষদ্ পত্রিকা
১২, রামমোহন মুখার্জী লেন,
হাওড়া-৭১১১০২

অথবা

সম্পাদিকা
যান্ত্রিক পরিষদ্ পত্রিকা
৮/১/১-এফ্, বীরপাড়া লেন,
কলিকাতা-৭০০০৫০

বেদ-শাখা ॥

কোনও গ্রন্থের শাখা বললে সাধারণতঃ আমরা তারই অপর খণ্ড বুঝি। বেদের শাখার অর্থ কিন্তু ভিন্ন। কথাটির অর্থ,—বিভিন্ন ক্রমে বেদ শিক্ষা।

গুরু তাঁর একজন শিষ্যকে এক নির্দিষ্ট দেবতা-ক্রম অনুসারে বেদ কণ্ঠস্থ করালেন অর্থাৎ সকল দেবতার মন্ত্র একত্রিত করে দেবতা অনুসারে কণ্ঠস্থ করালেন। দ্বিতীয় জনকে উপরোক্ত প্রকারে ছন্দ-ক্রম অনুযায়ী, তৃতীয়কে ঋষি-ক্রম অনুসারে এবং চতুর্থকে বিনিয়োগ অনুযায়ী কণ্ঠস্থ করালেন।

উক্ত ক্রমাবলী দ্বারা চারটি শাখার সৃষ্টি হলো।

প্রতিটি শাখাতেই প্রত্যেক তথা সমগ্র মন্ত্র রইলো কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ক্রমে পরিবেশিত হল। কাজেই একটি বেদের যে কোনও একটি শাখা পাওয়ার অর্থ, সমগ্র বেদটিই পাওয়া। একটি শাখা লুপ্ত হ'লে বেদটির অংশবিশেষ লুপ্ত হয়েছে বা অঙ্গ-হীনতা ঘটেছে একথা মনে করার কারণ নেই।

বেদ-শাখাগুলির সংখ্যা নিম্নোক্ত প্রকার,—

ঋগ্বেদ : এই বেদের একুশটি শাখা ছিল। যার মধ্যে ত্রুটিহীন রূপে মাত্র শাকল্য শাখাটিই পাওয়া যায়।

সামবেদ : সংগীত প্রধান এই বেদের রাগাদি ভেদবশতঃ এক সহস্র শাখা ছিল, যার মধ্যে মাত্র তিনটি বর্তমান। কৌথুমী, জৈমিনেয় ও রাণায়নীয়।

যজুর্বেদ : এর দুটি বিভাগ,—শুক্ল-যজুর্বেদ ও কৃষ্ণ-যজুর্বেদ। শুক্ল-যজুর্বেদের পনরোটি শাখা ছিল, যার মধ্যে কাণ্ব এবং মধ্যন্দিন এই দুই শাখা পাওয়া যায়।

কৃষ্ণ যজুর্বেদের ছিল ছিয়াশিটি শাখা। যার মধ্যে তৈত্তিরীয়, মৈত্রায়ণী, কঠ, কপিষ্ঠল ও শ্বেতাশ্বতর এই পাঁচটি শাখা পাওয়া যায়।

প্যাক্ড, প্যাকিঙ্, বলতে বুঝায়
একটিই নাম

PAOKWEL

আপনার জলের পাম্প্‌কে আরও কার্যকরী করে তুলতে প্যাক্‌ওয়েল্ ব্যবহার করুন।

ইউনাইটেড্ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল
অ্যাণ্ড্
ইঞ্জিনীয়ারিঙ্ কোং

২৭/২-ডি, স্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা-৭০০০০১
গ্রাম: SOFTHARD ফোন: ২২-৮৭০৩

অথর্ব বেদ : এর ন'টি শাখার মধ্যে পৈপুলাদি এবং শৌনকীয় শাখার অস্তিত্ব আছে।

মন্ত্র-সংখ্যা ॥

ঋগ্বেদে দশটি মণ্ডল এবং ১০৫৫২ মন্ত্র আছে।

এই বেদে দেবতাদের প্রার্থনা ও স্তুতি আছে।

যজুর্বেদে আছে চল্লিশটি অধ্যায়ে ১৯৭৫টি মন্ত্র। এই বেদে যজ্ঞের মন্ত্রই অধিক।

সামবেদে ১৮৭৫টি মন্ত্রের অধিকাংশই ঋগ্বেদের অনুরূপ।

অথর্ব বেদে বিশটি কাণ্ড ও ৫৯৮৭টি মন্ত্র আছে। এই বেদেও ঋক্ বেদের বহু মন্ত্র বর্তমান।

বেদ চতুষ্টয়ের সমগ্র মন্ত্রের পরিমাণ—২০৩৮৯।

(ক্রমশঃ)

মনে পড়ে

সে এক অতি তুচ্ছ, ব্যক্তিগত ঘটনা। শোনাবার মতো তো নয়ই, সোৎসাহে শোনবারও যোগ্য নয়।

১৯৭৩-এর ১৩ই জানুয়ারি বোম্বাই ভি. টি. থেকে ধরেছি ৪নং ডাউন বোম্বাই—এলাহাবাদ—হাওড়া মেল্। তেত্রিশ মাইল পথ পাড়ি দিয়ে কল্যাণ স্টেশনে গাড়ী পৌঁছতেই মাইক্রোফোনের আহ্বান শোনা গেলো,—Attention !...Passangers of 4 down Calcutta Mail are requested to note...the train will terminate its journey at Allahabad.

কি সর্বনাশ ! গাড়ীসুদ্ধ লোক হতভম্ব,—এ কি ধরণের তামাসা ! বোম্বাই স্টেশনে তো ঘুণাক্ষরেও এ কথা শোনালেন না কর্তৃপক্ষ। হয়তো অনেকে ওকথা আগে জানতে পারলে যাত্রা স্থগিত রাখতেন।

আমাদের সঙ্গে একই স্লিপার্ কোচ্-এ কয়েকজন গুজরাটি মহিলা একা একা চলেছেন কলকাতায়। বোম্বাইয়ে বাড়ীর লোকরা তুলে দিয়ে গেছেন, হাওড়ায় আত্মীয়রা নামিয়ে নেবেন এই ভরসায়। ওই নিঃসহায় মেয়েরা অত রাতে এলাহাবাদে কি করবেন কোথায় আশ্রয় নেবেন ?—ঘোষণার কারণ অনুসন্ধানে ছুটলেন অনেকে।

জানা গেলো সারা উত্তর প্রদেশের বিদ্যুৎ-কর্মচারীরা ধর্মঘট করায় এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রেল কর্তৃপক্ষ।

অন্যান্যদের মতো আমার সঙ্গীরাও ক্ষোভে, বিরক্তিতে ফেটে পড়তে লাগলেন। কিন্তু প্রতিকার তো নেই।

রাতটা কাটলো।

সকালে ইটারসি থেকে পুরুষরা প্রায় প্রতিটি বড় স্টেশনেই খোঁজ নিতে লাগলেন,—নতুন কোনও খবর এলো কি,—ধর্মঘট মিটলো কি,—গাড়ী কি যাবে হাওড়া পর্যন্ত ?

রাত পৌনে আটটায় গাড়ী পৌঁছলো শঙ্করগড়ে। স্টেশন অন্ধকার। ওখানে এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে রইলো। রাত সাড়ে দশটায় ঢুকলো গিয়ে এলাহাবাদ স্টেশনে।

সত্যই ওখানে যাত্রা শেষ করলো গাড়ীটা। আমাদের ভাগ্যে অতঃপর কি আছে জানতে চাওয়ায় আমাদের বলা হলো যে রাত একটায় হাওড়া হ'তে ১০৩ নম্বর শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত দিল্লীগামী এক্সপ্রেস্ আসছে। ওই গাড়ীটিও এলাহাবাদেই যাত্রা শেষ করবে ও ফিরে যাবে হাওড়ায়। আপনাদের হাওড়া পাঠানো হ'বে ঐ গাড়ীতে।

শেষ পৌষের কনকনে শীত। অত রাতে প্ল্যাটফর্মে কিভাবে আড়াই ঘণ্টা কাটানো সম্ভব বলে অনুযোগ করায় কর্তৃপক্ষ আমাদের গাড়ীতেই থাকতে দিলেন।

আমার সঙ্গীরা কিছু পুরি তরকারি এনে দিয়ে

যাবতীয় হার্ডওয়্যার, গ্লিল স্টোর্স
এবং
ইঞ্জিনীয়ারিঙ্ সিয়ের বিবিধ ভাবার
পরিবেশক

●

ইস্টার্ন ইঞ্জিনীয়ারিঙ্ স্টোর্স

৪০, নেতাজী সুভাষ রোড,

কলিকাতা-৭০০০০১

ফোন : ২২-৯৬১০

স্টেশন মাস্টারের ঘরে জটলা করতে গেলেন। আমি গেলাম না। জানলার ধারে বসে বসে একা ভাবতে লাগলাম আকাশ পাতাল···এগারোর এই যাত্রার নানা কথা। সারাটা দক্ষিণ ভারত ঘুরে মাসখানেক পরে চলেছি ঘরে। কত নামকরা তীর্থে গেছি, দেবস্থানে দেবস্থানে ঘুরেছি দর্শন করেছি কপালীশ্বর, পার্থসারথি, মীনাক্ষি, রামেশ্বর, কন্যা-কুমারী, পদ্ম-নাভস্বামী, চামুণ্ডা, আরও কত দেব দেবী। কিন্তু কোথাও কোনও কামনা-বাসনা জানাইনি,—কোন দেবতার কাছে কিছুই চাইনি। আমার প্রতি যাত্রার সঙ্গী টোটো আমায় শিখিয়েছিলেন, দেবতার কাছে না চাইতে।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ সেই শীতের রাত এগারোটায় আমার দারুণ ইচ্ছা হলো, আহা যদি এখন—:

কিন্তু আকাঙ্ক্ষার বস্তুটি দূরের কথা, একটা পান বিড়িওলাও তখন স্টেশনে নেই। কাজেই মনের ইচ্ছা অঙ্কুরেই মিলিয়ে যেতে লাগলো।

হঠাৎ চিন্তা-জাল ছিন্ন হলো,—

'মাইজী!'

অপরিচিত একটি কিশোর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সেই ডাক দিয়েছে আমাকে।

আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে চাইতেই একটি রেকাবি আমার সামনে তুলে ধরে বললো,—'লিজীয়ে।'

ইতস্ততঃ করে বললাম,—হা-আ-ম্?

'হাঁ। আপ্ হী কে লিয়ে। য়হ প্রসাদ হৈ। ওহ দেখিয়ে হমারী পূজা হো রহা হৈ।'

সবিস্ময়ে দেখলাম বেশ কিছুটা দূরে, প্ল্যাটফর্মের এক জায়গায় কয়েকজন মিলে পূজায় ব্যস্ত,—ধূপ দীপ জ্বলছে। তাঁরাই কেন জানিনা আমায় প্রসাদ পাঠিয়েছেন।

সবাইকে ছেড়ে আমাকে কেন প্রসাদ পাঠালেন ভেবে অবাক্ হলাম। আরও অবাক্ হলাম প্রসাদের বস্তু দেখে!—নতুন চারটি পাকা পেয়ারা! ক্ষণেক পূর্বে হঠাৎই আমার যা খাওয়ার তীব্র বাসনা হয়েছিল।

এ কি দেবতার কাছে আমার না-চাওয়ার সুপ্ত দন্ত ভাঙার জন্য? কিছুই প্রার্থনা না করে, তীর্থ সেরে, দেব সন্নিধান থেকে ফিরলে দেবতারা বুঝিবা স্বস্তি পাননা! তাই আমার ঐ ছোট্ট বাসনাটুকুই পূর্ণ করবার জন্য তাঁরা যেন সতর্ক হয়ে অপেক্ষা করছিলেন।—আমার দেবতা যদি আমার ইচ্ছার সুযোগ নিয়ে পরিতুষ্ট হয়ে থাকেন তো আমার তীর্থযাত্রা সার্থক হয়েছিল।

শ্রীমতী শুভ্রা বসু

বাক্‌সার দেব দেউল

শ্রী ভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

কিঞ্চিদধিক চারশ' বছর পূর্বে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর চণ্ডী-মঙ্গল কাব্যে লিখে গেছেন—

এড়াইল গাজবাড়া ঘাট কুলীন পাড়া
ডাইনে এড়ায় কুণ্ডারপুর
ভাস্কর মেলায় বায় বাক্‌সা এড়ায়ে যায়
বেলেড়া বাহিল কতদূর।

হাওড়া হ'তে মাত্র চব্বিশ কিলোমিটার দূরবর্তী বর্ধমান কর্ড লাইনের জনাই রোড স্টেশন থেকে দু'তিন কিলোমিটারের ব্যবধানে অবস্থিত জনাই ও বেগমপুর। তারই মাঝখানে ছায়া সুনিবিড় গ্রাম, —বাক্‌সা।

প্রাচীন পুঁথি ও কুল-গ্রন্থ সমূহে স্থানটি রাঢ়ী ও মধ্য-শ্রেণীয় ব্রাহ্মণ এবং দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ সমাজের অন্যতম কেন্দ্ররূপে উল্লিখিত হয়েছে।

বাক্‌সার চৌধুরীগণ সম্মানীয় ও প্রখ্যাত প্রাচীন কায়স্থ জমিদার বংশের সন্তান। বর্ধমান মহারাজার দেওয়ান ছিলেন এই চৌধুরী বংশীয় রাজারাম। রাজারামের ভাই দেওয়ান রূপনারায়ণ চৌধুরী ওয়ারেণ হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে নির্ভীক সাক্ষ্য দেওয়ায় সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ঘটনাটির উল্লেখ আছে বার্ক্ সাহেবের Impeachment of Warren Hastings পুস্তকে।

বাক্‌সার স্বনামধন্য এক ব্যক্তি যাঁকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষ থেকে তখনকার দিনে এক সহস্র মুদ্রা বেতনে দেওয়ান নিযুক্ত করা হয়েছিল, তিনি দেওয়ান ভবানী চরণ মিত্র। তাঁর অক্ষয় কীর্ত্তি ১৭৮০ খৃস্টাব্দে বাক্‌সার সরস্বতী নদীর তীরে স্থাপন

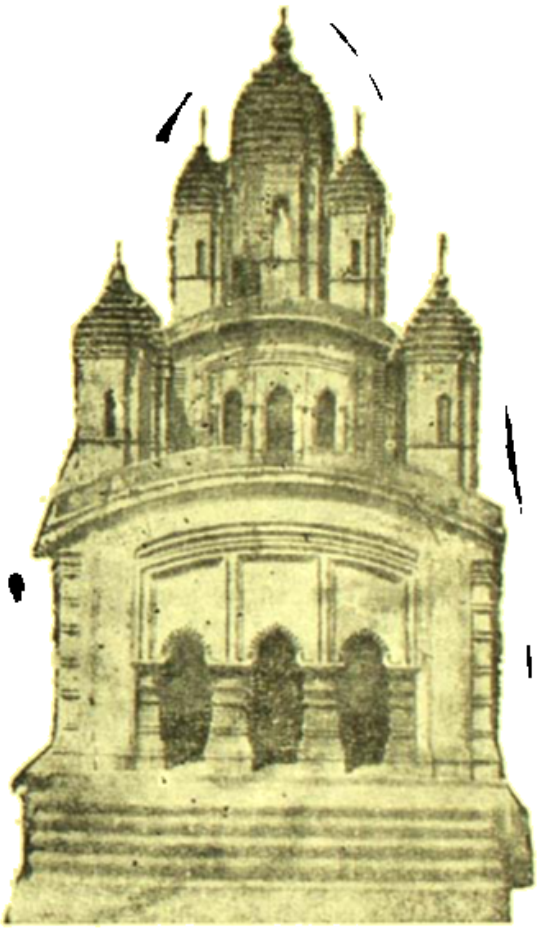

শ্রীশ্রীরঘুনাথ জিউর নব রত্ন মন্দির

মন্দির প্রতিষ্ঠা। মন্দিরগুলির প্রত্যেকটির উচ্চতা বাট ফিট্। এই মন্দির গোষ্ঠী সংলগ্ন উন্মুক্ত মাঠে চৈত্র সংক্রান্তির দিন এক বিরাট মেলা বসে।

অ্যাসবেসটস্ ম্যাগনেসিয়া
কম্পাউণ্ড—৮৫%
অ্যাসবেসটস্ ইন্সুলেশন, প্লেট ও পাইপ
(H D – 50)
এবং
অ্যাসবেসটসের যাবতীয় ইন্সুলেশন,
ফ্রাক্সার প্রস্তুতকারক।

ইন্সুলেশন অ্যাণ্ড
রিফ্র্যাক্টরিজ (ইণ্ডিয়া)

১/২, ১/৩, চেতলা রোড,
কলিকাতা-৭০০০৫৩

দক্ষিণেশ্বরের দ্বাদশ শিবমন্দির বাক্সার আলোচ্য মন্দিরগুলির অনুরূপ।

জনাইয়ের উত্তর পূর্ব দিকে অবস্থিত বাক্সার দেব দেউলগুলির মধ্যে আর একটি উল্লেখযোগ্য মন্দির শ্রীশ্রীরঘুনাথ জীউর নব-রত্ন মন্দির। বাঙলার প্রাচীন দেবালয়গুলির মধ্যে এই সুবৃহৎ মন্দিরটি শুধু অন্যতমই নয়, বৈশিষ্ট্যেও অনবদ্য। ১৭৯২ খৃস্টাব্দে ভ্রূকুটরাম মিত্র প্রতিষ্ঠিত এই অপূর্ব মন্দিরটি স্থাপত্য-শিল্পের এক অসাধারণ নিদর্শন।

মন্দির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে মিত্র মহাশয় বিগ্রহের সেবার জন্য কিছু জমিও উৎসর্গ করে গেছেন। ঐতিহাসিক হাণ্টার সাহেব তাঁর 'স্ট্যাটিস্টিক্যাল্ অ্যাকাউন্টস্ অফ বেঙ্গল' গ্রন্থে মন্দিরটির বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন।

রথাকৃতি মন্দিরটিতে নবরত্নের ন'টি ভাগ রয়েছে। মন্দিরটির কারুকার্য খচিত ইটগুলি আকর্ষণীয় দ্রষ্টব্য ছিল। সম্প্রতি সংস্কারের সময়ে বৈশিষ্ট্য হারিয়েছে।

দেবালয়টির প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে একটি কিংবদন্তী আছে।

সে প্রায় তিনশ' বছর আগের কথা। পদব্রজে তীর্থযাত্রায় বেরিয়েছিলেন মিত্রবাড়ীর একজন। ধূমপানের জন্য আগুন জ্বালাবার প্রয়োজনে তাঁর সঙ্গে ছিল একখণ্ড চকমকি। সেই চকমকি পাথরের মধ্যেই ছিলেন মিত্রবংশের ভবিষ্যৎ কুলদেবতা,—রঘুনাথজী। ঐ বংশের প্রতিষ্ঠাতা পরশুরাম মিত্র স্বপ্ন পেলেন কে যেন বলছে 'ওরে তোর ভাইয়ের বেতের বাঁপিতে আমি আটকে পড়েছি, তুই আমাকে উদ্ধার কর। আমি রঘুনাথ, তোদের কুলদেবতা হবো বলে সুদূর নেপাল থেকে এসেছি।'

পরশুরাম মহা সমারোহে প্রতিষ্ঠা করলেন রঘুনাথজীকে, নবরত্ন মন্দিরে।

অতঃপর রঘুনাথকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলো বাণেশ্বর মহাদেব, শ্রীধর রাধাকান্ত, মধুসূদন, চণ্ডিকা, মনসাদির মন্দির। মন্দিরগুলির অধিকাংশই আজও বর্তমান।

জাতক কথা

একলব্য

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥ তেরো ॥

টুনটুন বললো : একটা বোকার গল্প বলুন 'ব্যোমকা'।

: বোকার গল্প ? বোকার গল্প জানি না।

: বা রে ! একদিন তো বলেছিলেন, বোকার গল্প বলবো।

: বলেছিলাম বুঝি ?

হ্যাঁ হ্যাঁ !—এক সঙ্গে টুনটুন আর চাঁদাই বলে উঠলো।

ব্যোমকাকা দু'তিন মিনিট চুপ করে ভেবে নিয়ে শুরু করলেন,—

: তখন ব্রহ্মদত্ত বারানসীর রাজা।

বোধিসত্ত্ব এক বিখ্যাত ব্রাহ্মণ বংশে জন্মালেন এবং বড় হয়ে তক্ষশিলায় গিয়ে নানা বিষয়ে পণ্ডিত হয়ে উঠলেন। তারপর বারানসীতে ফিরে শিক্ষকতা করতে লাগলেন।

তাঁর পাঁচ শ' ছাত্র ছিল। যার মধ্যে একজন ছিল অত্যন্ত জড়-বুদ্ধি।

তখনকার দিনে, অনেক ছাত্র বা শিষ্যকে গুরুর বাড়ীতে থাকতে হতো এবং তাঁর বাড়ীর কাজ করে দিতে হতো। জল তোলা, কাঠ আনা, রান্না, সব কিছুই করতে হতো। তা ছাড়া গুরুর সেবাও ছিল।

একদিন রাতে বোধিসত্ত্ব শুয়ে পড়লে সেই জড়-বুদ্ধি শিষ্য তাঁর গা, হাত, পা টিপে দিতে লাগলো।

খানিক পরে বোধিসত্ত্ব বললেন—তুমি শোওগে। যাবার আগে আমার খাটিয়ার পায়াগুলো একটু ঠিক করে দিয়ে যাও, একদিকে বড় উঁচু নীচু হয়ে কেবলই দুলছে।

শিষ্য পায়া ঠিক করতে গিয়ে দেখলো, এক কোণের একটি পায়া ভেঙে পড়ে গেছে। সে তখন নিজের উরুর ওপরে খাটিয়ার সেই কোণটা রেখে, সারারাত বসে রইলো।

ভোরে উঠে বোধিসত্ত্ব তাকে খাটিয়ার ধারে বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন—একি, তুমি এ ভাবে বসে ?

শিষ্য বললো – খাটিয়ার এ দিকের পায়াটা নেই তাই আমি উরুতে রেখে বসে আছি।

এ কথা শুনে বোধিসত্ত্বের মন স্নেহে ভরে উঠলো।

তিনি ভাবলেন,—এই ছেলেটি আমার সবচেয়ে

ভক্ত, কিন্তু দুঃখের বিষয় পাঁচশ ছাত্রের মধ্যে এ সবচেয়ে জড়-বুদ্ধি এই বেচারা কিছুই শিখতে পারছে না। একে কি বিদ্যান করে তোলার কোন উপায়ই করা যাবে না!

ভাবতে ভাবতে তিনি পথ খুঁজে পেলেন। স্থির করলেন, ছেলেটি যখন কাঠ জোগাড় করে ফিরবে তখন ওকে জিজ্ঞেস করবো,—পথে কি দেখেছো, কি করেছো। ও উত্তর দেবে এই এই দেখেছি, এই এই করেছি। আমি তখন জিজ্ঞেস করবো, তুমি যা দেখেছো তা কিসের মতো,—যা করেছো তা কিসের মতো? আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে, অন্য বস্তুর সঙ্গে ওর নিজের দেখা জিনিসের উপমা দিতে হবে। এইভাবে ধীরে ধীরে ও জ্ঞান লাভ করবে।

উপায় ঠিক করে তিনি জড়-বুদ্ধিকে ডেকে বললেন—আজ থেকে তুমি যখন কাঠ জোগাড় করতে যাবে তখন পথে যা দেখবে, যা খাবে বা পান করবে, ফিরে এসে তা আমায় জানাবে।

সে ঘাড় নেড়ে কাঠ আনতে চলে গেলো।

সেদিন বনের পথে সে একটা সাপ দেখলো এবং ফিরে এসে বোধিসত্ত্বকে বললো—আমি আজ একটা সাপ দেখেছি।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন—সাপ কিসের মতো দেখতে?

ছেলেটি উত্তর দিলো—ঠিক যেন লাঙ্গলের ঈষ!

বোধিসত্ত্ব বললেন—চমৎকার উপমা হয়েছে। লাঙ্গলের ঈষা ও সাপের মধ্যে বেশ কিছুটা মিল আছে।

ভাবলেন,—মনে হচ্ছে, ছেলেটিকে এইভাবে বিদ্যান করে তোলা যাবে।

আর একদিন ছাত্রটি বনে হাতী দেখে এসে বোধিসত্ত্বকে সে কথা জানালো।

তিনি বললেন—হাতী কিসের মতো দেখতে বলো।

সে বললো—লাঙ্গলের ঈষের মতো।

বোধিসত্ত্ব ভাবলেন, হাতীর শুঁড়টাকে হয়তো লাঙ্গলের ঈষার মতো বলা চলে, কিন্তু হাতী কি করে ঈষের মতো হতে পারে। বোধহয়, ছেলেটির বুদ্ধি কম বলে, হাতীর সবকিছু ছেড়ে দিয়ে, শুধু শুঁড়টিই লক্ষ্য করে ও এমন উপমা দিচ্ছে। যাক, তবু কিছুটা বলেছে তো।

কয়েক দিন পরে ছাত্রটি বোধিসত্ত্বকে বললো—আজ আমি আখ খেয়েছি।

বোধিসত্ত্ব তাকে জিজ্ঞেস করলেন আখ কিসের মতন দেখতে?

সে বললো—ঠিক যেন লাঙ্গলের ঈষ।

বোধিসত্ত্ব দেখলেন উপমাটি মোটেই ঠিক নয়। তবু ছাত্রটিকে তিনি কিছুই বললেন না।

এর কিছুদিন বাদে তাঁর ছাত্ররা সকলে এক জায়গায় নিমন্ত্রণ খেতে গেলো। সেখানে তারা অন্যান্য খাবারের সঙ্গে দই, দুধ ও গুড় খেয়ে এলো। জড়-বুদ্ধি ছাত্রটি এসে বোধিসত্ত্বকে জানালো, সে দুধ খেয়েছে।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন—দুধ কিসের মতো দেখতে?

ছাত্রটি বললো—ঠিক যেন লাঙ্গলের ঈষ।

বোধিসত্ত্ব এমন অদ্ভুত উপমা শুনে চিন্তা করতে লাগলেন, এ কি ভয়ানক স্থূল-বুদ্ধি! সাপকে এ বলেছিল লাঙ্গলের ঈষার মতন,—উপমাটি ভালই হয়েছিল। হাতীকেও বলেছিল ঈষার মতো, তা'তেও

অন্ততঃ হাতীর শুঁড়টার সঙ্গে কিছুটা মিল ছিল। তারপর আখের সম্বন্ধেও বলেছিল ওই কথা। তা'তে যে বিন্দুমাত্র মিল ছিল না এ কথা বলা যায় না। কিন্তু শ্বেতবর্ণ তরল-পদার্থ যে দুধ, তা'কে যে ও কি করে লাঙ্গলের ঈষ অর্থাৎ বাঁটের মতো বললো!

বোধিসত্ত্ব শেষ পর্যন্ত নিশ্চিত হলেন যে, ঐ ছেলেটি একেবারে জড়-বুদ্ধি,—ওকে লেখাপড়া শেখানো অসম্ভব

• লাঙ্গলীষ জাতক

॥ চৌদ্দ ॥

: রাজগৃহ কোথায় রে টুনটুন্ জানিস?—ব্যোমকাকা জিজ্ঞেস করলেন।

: না তো।

চাঁদাই বললো: তুই কি করে জানবি, তুই তো আর যাসনি সেখানে! আমরা গিয়েছিলুম।

: তবে তুমিই বলো। টুনটুন্ বললো।

: রাজগির নালন্দা বেড়াতে যেতে শুনেছিস কাউকে?

: হুঁ। এই তো সেজ মামারা গিয়েছিলেন গতবারে।

: ওই রাজগীরের নামই প্রাচীনকালে ছিল, রাজগৃহ। হাওড়া থেকে পাটনা যাওয়ার পথে বখ্‌তিয়ারপুরে নেমে যেতে হয় রাজগিরে।—ঠিক বলেছি ব্যোমকা'?

ব্যোমকাকা বললেন: ঠিক। শোন এবার,—

: রাজগৃহ যখন মগধের রাজধানী ছিল সেই সময়ে, বোধিসত্ত্ব একবার মগধ রাজ্যের 'মচল' গ্রামে, বিখ্যাত এক বংশে, জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নাম হয়েছিল,—মঘ কুমার।

বড় হলে লোকে তাঁকে মঘ মাণবক বলে ডাকতে লাগলো।

মাণবক শব্দটি ছোট মানুষ বা বামনকে বোঝায়। বোধহয়, তিনি খুব বেঁটে ছিলেন তাই তাঁকে সবাই ওই নাম দিয়েছিল।

মঘ অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন। সব সময়ে সৎ ও জনহিতকর অর্থাৎ, মানুষের যাতে মঙ্গল হয় সেরূপ কাজে সময় কাটাতেন। বিনা পারিশ্রমিকে তিনি, নিজের হাতে, গ্রামের পথঘাট পরিষ্কার করে দিতেন, —পুকুরের পাঁক তুলে দিতেন। নিজের খরচায় গ্রামের মেলা-তলায় একটি মণ্ডপ ও বিনা পয়সায় থাকার জন্ত একটি যাত্রী-নিবাস তৈরি করে দিয়েছিলেন।

অভ্যুদয়ের কিশোর সাহিত্য

বিমল দত্তের
ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ছৌঠিক গল্প
বোধিসত্ত্বের
কঙ্কাল উপকূল
মনোরঞ্জন ঘোষের
প্রত্যাবর্তন

অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০১২

তাঁদের গ্রামের বেশির ভাগ লোকই খুব দুর্দান্ত প্রকৃতির ছিল। তারা মদ খেয়ে মারামারি করতো ও নানা কু-কাজে দিন কাটাতো।

মঘ-মাণবকের ভাল ভাল কাজ দেখে গ্রামের ঐসব লোক ক্রমে ক্রমে তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়ে তাঁরই মতো পরোপকারী হয়ে উঠলো। তারা ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই মঘের মতো বিনা পারিশ্রমিকে গ্রামের নানা কাজ করবার জন্য ছুটে যেতে লাগলো। রাজপথ পরিষ্কার রাখা ও মেরামত নিজেরাই করতে লাগলো। তারা পুকুর কাটলো, সাঁকো তৈরি করলো,—গরীব-দুঃখীদের নানা সাহায্য দিতে লাগলো।

সব ব্যাপারেই তারা মঘ-মাণবকের উপদেশ নিয়ে কাজ করতে লাগলো।

গ্রামের মোড়লের কিন্তু এসব মোটেই পছন্দ হলো না। সে ভাবলো,—যখন গ্রামের লোকে মদ খেতো,—গোলমাল, মারামারি করতো,—তখন তাদের যে অর্থ-দণ্ড হতো তা' থেকে আমার কেমন ভালো আয় হতো। কিন্তু, এই মঘ-মাণবকের শিক্ষার ফলে এখন গ্রামবাসীরা সে সব অভ্যাস ত্যাগ করেছে এবং আমার উপার্জনের পথ একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। অতএব এই মঘ-মাণবক ও তার দলকে শেষ করে দিতে হবে।

এইসব চিন্তা করে সে রাজার কাছে গিয়ে বললো —মহারাজ, আমাদের গ্রামে একদল ডাকাত জুটেছে, তারা লুঠপাট করে বেড়াচ্ছে ও আরও নানারকম উৎপাত করছে।

রাজা আদেশ দিলেন—তাদের ধরে আনো।

মোড়লের সঙ্গে তখনি অনেক সিপাই গিয়ে মঘ ও তার সঙ্গী গ্রামবাসীদের ধরে আনলো।

মোড়লের কথা মিথ্যা হতেই পারে না এই বিশ্বাসে, কোন কিছু জিজ্ঞেস না করে, রাজা বন্দীদের হাতীর পায়ের তলায় পিষে মারতে বললেন। সিপাইরা রাজপ্রাসাদের সামনের মাঠে মঘ-মাণবক ও তাঁর সঙ্গীদের হাত-পা বেঁধে ফেলে রেখে হাতী আনতে গেলো।

মঘের সঙ্গীরা মৃত্যু নিশ্চিত জেনে কাতর হয়ে পড়লো। মঘ তাই দেখে তাদের বললেন,—তোমরা ভয়ে সৎ-চিন্তা ভুলো না। ওই হিংস্রক মোড়ল এবং এই রাজা, দুজনকেই আমাদের আপনজন, আত্মীয়ের সমান মনে করো। যে হাতী আমাদের বধ করতে আসছে তা'কেও ভাবো আমাদের ভালবাসার পাত্র।

কিছুক্ষণের মধ্যে সিপাইরা বিরাটাকার এক হাতীকে নিয়ে এলো এবং হাত-পা বাঁধা অবস্থায় মাটিতে পড়ে থাকা, মঘ-মাণবক ও তাঁর সঙ্গীদের মাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলো। কিন্তু কি আশ্চর্য, হাতী মঘদের দেখেই বিকট চীৎকার করে পালিয়ে গেলো।

সিপাইরা অন্য একটা হাতীকে আনলো,—সেও একই ভাবে পালালো।

তারপর আরও চার পাঁচটা হাতী ওইভাবে পালিয়ে গেলো।

রাজা তা' দেখে ভাবলেন, বন্দীদের কাছে বোধ-হয় এমন কোনও ওষুধ আছে যার গন্ধে হাতীগুলো ওদের কাছে যেতে পারছে না। সিপাইদের সে কথা বলতেই তারা মঘ-মাণবকের দলের কাছে কোনও ওষুধ, শিকড়-টিকড় আছে কিনা খুঁজে দেখলো কিন্তু কিছুই পাওয়া গেলো না।

রাজা তখন ভাবলেন, এরা তাহলে নিশ্চয় কোনও মন্ত্র জানে।

তাঁর আদেশে সিপাইরা গিয়ে প্রথমে মঘকে জিজ্ঞেস করতেই তিনি বললেন,—হ্যাঁ, আমরা মন্ত্র জানি।

সঙ্গে সঙ্গে সিপাইরা হাত পায়ের বাঁধন খুলে মঘকে টানতে টানতে রাজার সামনে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করালো।

রাজা জিজ্ঞেস করলেন,—শিগ্‌গির বলো, কি মন্ত্র জানো।

মঘ বললেন,—মহারাজ, আমরা এই ক'জন লোক প্রাণীহত্যা করি না, মিথ্যা কথা বলি না, কুপথ এড়িয়ে চলি, মদ খাই না, জীবজন্তু সব প্রাণীকেই বন্ধু ভাবি, কেউ নিজে থেকে কিছু না দিতে চাইলে নিই না, সাধারণ মানুষের উপকারের জন্য বিনা পারিশ্রমিকে পথ ঘাট ও জলাশয় পরিষ্কার করে দিই। এই হলো আমাদের জীবনের মন্ত্র,—এই মন্ত্রের শক্তিতেই আমরা শক্তিমান।

রাজা, মঘের কথা শুনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন এবং তাঁদের মুক্তি দিয়ে সেই দুষ্ট মোড়লকে, মঘ ও তাঁর সঙ্গীদের চাকর হয়ে থাকতে আদেশ দিলেন।

তারপর মোড়লের ঘর-বাড়ী, টাকা-কড়ি, সব কেড়ে নিয়ে মঘের হাতে তুলে দিলেন, জনসাধারণের কাজে লাগাবার জন্য। মঘ এবং তাঁর সঙ্গীদের মারবার জন্য যে হাতীগুলি আনা হয়েছিল সেগুলি-কেও দিয়ে দিলেন মঘদের গ্রামের উন্নতি করার কাজে সাহায্য করবার জন্য।

স্বপ্নে পাওয়া নয়
সন্ন্যাসী-প্রদত্ত নয়
দুষ্প্রাপ্য এক আয়ুর্বেদীয় পদ্ধতিতে প্রস্তুত
অর্শের মহৌষধ
অস্ত্রোপচারেও নিরাময় হয়নি এরূপ জটিল ক্ষেত্রেও ফলপ্রদ
ঔষধ প্রাপ্তির সময় : সন্ধ্যা ৭টা হ'তে রাত ৯টা
রবিবার সকাল ৮টা হ'তে ১২টা
শ্রীমতী গীতা সরকার
C/o. শ্রীব্রজেন সরকার
মন্থন কানন
পো: রহড়া
[শতদল রেল ষ্টেশন থেকে তিন মিনিটের পথ]

সৎপথে থাকলে ও সৎকাজ করলে জয় যে নিশ্চিত তা বোঝা যায় বোধিসত্ত্বের এই মঘ-মাণবক জন্মের কাহিনী থেকে।

রূপমতীর দুর্গে

শ্রী বীণাধর

অট্টালিকাটির ছাদ হ'তে দূরে দেখা যাচ্ছে নর্মদাকে।

পাহাড়ী অঞ্চলে শরতের দুপুরের খর রৌদ্রেও মনে হচ্ছে পাতলা নীলাভ কুয়াশায় ঢাকা। চিকমিক করে বয়ে চলেছে স্রোতস্বিনী নর্মদা।

সূর্য কিছুক্ষণ হলো মাঝ আকাশ ছাড়িয়ে গেছেন। কয়েক ঘণ্টা পরে আত্মগোপন করবেন দূর পাহাড়ের অন্তরালে নামবে অন্ধকার, নামবে রাত্রি।

সেদিনও রাত্রি নেমেছিল, নর্মদার তীরে, এই অট্টালিকায়, ঐ প্রান্তরে।

সূচীভেদ্য অন্ধকার।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ভেসে এল সেই অপূর্ব সঙ্গীত,—কিন্নরী-কণ্ঠের সুর। সুর তো নয়, সুরা!

তারই নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে সুলতান বাজবাহাদুর, রাজ্যেশ্বর বাজবাহাদুর সেই অন্ধকারে, জনহীন প্রান্তরে ছুটতে লাগলেন। লক্ষ্য, গন্তব্য, সেই সুরের উদ্ভব-কেন্দ্র। যে সুর, যে সঙ্গীত ক'দিন ধরে তাঁকে টানছে, উন্মাদ করে তুলেছে। যা সৃষ্টি করেছে পারিকার প্রতি তাঁর এক অনির্বচনীয় অনুভূতি। শাসক বাজ-বাহাদুরের ভিতর থেকে বের করে এনেছে একটি দুর্বল সাধারণ মানুষকে। সুরের গহনে হারিয়ে গেছেন রাজ্যেশ্বর বাজবাহাদুর। ছুটে চলেছেন তিনি কোন অদৃশ্য হস্তের ইঙ্গিতে,—কোন অজ্ঞাত-তৃষ্ণায়। শুধু ধ্বনিমাত্র সম্বল ক'রে।

বেগে বইছে বাতাস। তাই বার বার হারিয়ে যাচ্ছে সুরের দিক। কখনো তা ডাইনে, আবার কখনো মনে হচ্ছে বাঁয়ে। বাজবাহাদুর ছুটছেন দিশাহারা হয়ে।

অবশেষে, নর্মদার তীরে একজায়গায় দেখতে পেলেন হাওয়ায় উড়ছে একখানি ওড়না। দেখা যাচ্ছে অস্পষ্ট এক নারীমূর্তি। অন্ধকারেও দেখা যাচ্ছে তার শুভ্র বাহু দুটি। ছুটে গিয়ে তার সামনে দাঁড়ালেন বাজবাহাদুর।

ভয় পেয়ে দু' পা পেছিয়ে গেলো রমণী। কম্পিত স্বরে প্রশ্ন করলো—

: কে, কে আপনি?

সুলতান উত্তর দিলেন: ভয় পেওনা। আমি বাজবাহাদুর, মালওআর সুলতান।

রমণী আশ্বস্ত হয়ে বললো: ও।

: তুমি কি মনে করেছিলে?

: চোর, দস্যু।

বাজবাহাদুর হেসে বললেন: এখন বুঝলে তো, তা' নয়?

: তার চেয়ে কমও নয়। আপনি কেন আমার সঙ্গীতে হন্তারক হলেন!

বাজবাহাদুর আহত কণ্ঠে বললেন: হন্তারক! না, হন্তারক হতে আমি আসিনি। আমি শুধু তোমায় দেখতে এসেছিলাম। তোমার সুরের জালে আবদ্ধ হয়ে ক'দিন ধরে আমি যন্ত্রণা পাচ্ছি। আজ তাই তুমি কে, তুমি কি সত্যই মানবী না কোনও ছলী, না কি কোনও ঐশ্বরিক ছলনা, তা-ই দেখবার জন্য ছুটে এসেছি।

আপনি মালওআর সুলতান হোন অথবা যেই হোন আমার সঙ্গীতে ছেদ ঘটিয়ে অন্যায় করেছেন। যান আপনি। আর কখনও আসবেন না।

বেদনাহত কণ্ঠে সুলতান বললেন: বেশ, আমি যাচ্ছি। আর কখনও তোমার সামনে আসবোনা। শুধু একটি অনুরোধ, তুমি আমায় মনে রেখো। আমি বাজবাহাদুর।

তারপর দু'জনেই হলেন মুহ্যমান।

কিন্তু পরদিনই আবার সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে উঠতেই বাজবাহাদুর ছুটে গেলেন নর্মদার তীরে। আকণ্ঠ পান করতে লাগলেন সেই কণ্ঠ-সুধা,—মাতা নর্মদার উদ্দেশে নিবেদিত সেই সঙ্গীতাঞ্জলি। গায়িকার স্বর কিন্তু সেদিন মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে। কোথায় যেন একটি তন্ত্রী নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে।

যতই দিন যেতে লাগলো ততই বেদনার রসে ভরে উঠতে লাগলো গায়িকার সঙ্গীত। বিস্রস্ত হ'তে লাগলো তার সুর।

অবশেষে প্রতিজ্ঞাচ্যুত হয়ে বাজবাহাদুর আবার একদিন গায়িকার নিকট উপস্থিত হলেন।

কুণ্ঠিতস্বরে বললেন: আমি রোজই এখানে আসি কিন্তু তোমায় কথা দিয়েছি বলে তোমার সামনে আসতে পারিনা। দূরে ঐ গাছটার আড়ালে দাঁড়িয়ে তোমার কণ্ঠ-সুধায় বুক ভরে নিতে চেষ্টা করি। যতক্ষণ তুমি গাও আমি পান করি। তবু তৃষ্ণা মেটেনা যে!

উত্তরে কিছুই বললো না রমণী। বাজবাহাদুরের চোখের উপর কাতর দৃষ্টি মেলে কিছুক্ষণ নির্বাক বসে রইল। তারপর হঠাৎ কেঁদে উঠে বললো: আপনি কেন আমার এ ক্ষতি করলেন! আমি তো নর্মদার উদ্দেশে, ঈশ্বরের উদ্দেশে গাইতাম।

চমকে উঠলেন নবাব, ক্ষতির অভিযোগে।

মুহূর্তের জন্য নীরব থেকে বললেন: স্রষ্টাকে তুমি যে সঙ্গীত-সুধা নিবেদন করছিলে তার মায়ায়, তার স্পর্শে, তারই একটা সৃষ্টি,—একটা মানুষ, বাঁধা পড়েছে। একি অস্বাভাবিক? একি অন্যায়? —তবু যদি তোমার কোন ক্ষতি করে থাকি তো সেই ক্ষতি পূরণ করার জন্য মালওআর অধিপতি, আমি, তোমার সকল ভার গ্রহণের আরজি পেশ করছি। দেবে আমায় তোমার ঐ সুন্দর হাত দুখানি? তোমার সেবায়—

বাধা দিয়ে রমণী বললো: ছিঃ! আপনি রাজেশ্বর। আমি অতি সামান্যা।

: না না। তোমার কাছে আমি রাজেশ্বর নই, বাজবাহাদুরও নই। আমি এক সাধারণ মানুষ। তোমার হৃদয় সান্নিধ্যের তৃষ্ণায় কাতর।

: কিন্তু সুলতান, আপনি কি জানেন আমি কে? কোথায় আমার জন্ম, কোথায় আমার বাস?

: জানার প্রয়োজন আছে কি?

: আছে।

: বেশ, বলো।

দূরের এক বসতির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশে রমণী বললো : আমি ওইখানে থাকি।

বিচলিত হয়ে বললেন রাজবাহাদুর : ওখানে তো—

হেসে বললো রমণী :

স্বীকৃতি দেননি ওখানে তাদেরই বাস।

: তা হোক। আমি তোমাকেই চাই, তোমার উৎপত্তির ইতিহাসকে নয়।

রমণীর বাহু স্পর্শ করলেন রাজবাহাদুর। তার চোখ হ'তে গড়িয়ে পড়লো দু' ফোঁটা জল বললো : তোমার মনের এতটা জায়গা আমার জন্ত ছেড়ে দিয়েছো নবাব!

তৃপ্তির হাসিতে উজ্জ্বল হলেন রাজবাহাদুর।

: আমার নামটা জানতে চাওনা? রমণী প্রশ্ন করলো।

রাজবাহাদুর বললেন : না। তোমার নাম যে আমিই রাখবো। তোমার নাম রাখলাম, রূপমতী। —তোমার অন্তরে-বাইরে এত রূপ! তাই তোমার নাম রাখলাম রূপমতী।

সেই রূপমতীর উপাখ্যানের স্থান, মাণ্ডু। ইন্দোর শহর থেকে ষাট মাইল।

আজ হারিয়ে গেছে সেই জনপদ, 'সুকৃত-সাগর'-এর গ্রন্থকার রত্ন মন্দাঙ্গিনীর বর্ণনানুযায়ী যার লোকসংখ্যা ছিল সাত লক্ষ।

মুসলিম আধিপত্যের পূর্বে, পরমার রাজগণের আমলে স্থানটির নাম ছিল মণ্ডপদুর্গ, মণ্ডপাচল, মণ্ডপগিরি, মণ্ডপাদ্রি তথা মণ্ডপশৈল।

বর্তমান রাজস্থানের কোল ঘেঁষে, পূর্বে বুন্দেলখণ্ড, পশ্চিমে গুজরাট, উত্তরে চম্বল আর দক্ষিণে নর্মদার সীমারেখায় পরিবৃত রাজ্য ছিল মাল্‌ওঅ (মালব)। তারই রাজধানী ছিল মাণ্ডু।

আষাঢ় মাসের শেষ সপ্তাহ।

ক'দিন আগে বেশ বৃষ্টি হয়ে গেছে। আর শুকনো ঘাস, গাছের পাতা, উজ্জ্বল সবুজ হয়ে উঠেছে বৃষ্টির ছোঁয়া লেগে। পরম পুরুষ তাঁর প্রকৃতি-প্রিয়াকে সাজিয়েছেন নব বেশে, —শ্যামল সজ্জায়।

মধ্যপ্রদেশের এই উপত্যকাটির মতো এত সবুজ মধ্য-পশ্চিম ভারতে বড় একটা দেখা যায় না।

আধুনিক জীবনযাত্রার অজ্ঞ মানুষগুলিও সবুজ, তাজা মনের মানুষ।

পুরুষরা ছোট ধুতি ও বেশির ভাগই মোটা সাদা কাপড়ের মেরজাই পরেছে। মাথায় পরনের ধুতির চেয়েও লম্বা কাপড়ের মস্ত পাগড়ি। হাতে লাঠি, পায়ে নাগরা।

মেয়েরা টকটকে লাল আর জাফরানি পরিচ্ছদে সেজে খর সূর্যালোককে যেন প্রখর করে তুলেছে। ঘাঘরা, চোলী আর উত্তরীয় তাদের বসন। সঙ্গে আছে স্বর্ণেতর ধাতুর প্রচুর অলঙ্কার। সকলেই ঈষৎ অবগুণ্ঠিতা। মানিয়েছে চমৎকার। কারণ সেই ঈষৎ অবগুণ্ঠনের নীচে দেখা যাচ্ছে ব্রীড়ালাঞ্ছিত মুখগুলি।

ঘোমটা ওদের শুধু একটা পোশাকী ব্যাপার বা প্রথা নয়,—ওতে আছে সরম লাগার ইঙ্গিত।

গ্রাম থেকে পাঁচ ছ'টি দল এসেছে। তাদের মধ্যের একটি স্ত্রীলোককে এক প্রৌঢ় সহযাত্রী প্রশ্ন করলেন : তোমরা কোথা থেকে এসেছো?

সে একটি গ্রামের নাম বললো।

সহযাত্রীটি অতঃপর প্রশ্ন করলেন : তোমার মরদ ?

মেয়েটি অঙ্গুলি নির্দেশে দেখালো একটি পিতলের ঘটিতে জল সংগ্রহ করে নিয়ে আসছে বছর ত্রিশ-বত্রিশের এক যুবা।

মেয়েটির ঈষৎ অবগুণ্ঠিত কপাল ও মুখে তার উত্তরীয়ের রক্ত আভা ফুটে উঠলো। সে মুখ নীচু করলো।

মনে হলো এদের জন্যই তো অবগুণ্ঠন। অবগুণ্ঠন এদের আবরণ নয়,—সার্থক আভরণ, অলঙ্কার।

একটা গাছতলায় বসে ওরা জলযোগ করলো। শুকনো গজার মতো মিঠাই আর 'চূড়া-পোয়া'. চিঁড়ের তৈরি সুস্বাদু খাবার। তারপর আমাদেরই সঙ্গে বেরলো মাণ্ডুর অতীত গৌরবের সাক্ষীদের দেখতে।

যান্ত্রিক পরিষদ
পত্রিকা

খুচরা ও পাইকারী
বিক্রেতা

★

নারায়ণ বুক ডিপো
১৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০১২

ধ্বংসাবশেষগুলি ছড়িয়ে আছে তিন চার মাইল জুড়ে। পরমার, ঘোরী, খিল্‌জী বংশের স্মৃতি বুকে নিয়ে জরাগ্রস্ত বৃদ্ধের মতো যেন নিঃশব্দে চেঁচাচ্ছে—আমাদেরও যৌবন ছিল।

দু'পাশে কপূর তলাও ও মুঞ্জ তলাও নামে বিশাল দু'টি জলাশয় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে জাহাজ-মহল, সুলতানদের প্রাসাদ।

জাহাজ-মহলের পশ্চিমে একটি সুবৃহৎ কূপ, চম্পা। জল অনেক নীচুতে। সুড়ঙ্গ পথের মতো এক সোপান শ্রেণী দিয়ে কূপটির ভিতরে জলের সমতল পর্যন্ত যাওয়া যায়। জলের সমতলে একটি চত্বর আছে। গ্রীষ্মের দিনে হেরেমের সুন্দরীরা ওখানে বিশ্রাম করতেন।

জাহাজ মহলের অদূরে একটি অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ রয়েছে। নাম তার মেদিনী রায়ের মহল। মেদিনী রায় ছিলেন দ্বিতীয় মাহমুদ খিল্‌জীর উজির।

খিলজীদের আগে এখানে রাজত্ব করেছিলেন ঘোরীরা। ঐ বংশের হোশাং শাহের সমাধিটি আজও অটুট। সুলতান নিজেই তাঁর সমাধিটির নির্মাণ শুরু করেছিলেন। তিনি তাঁর পিতা দিলওয়ার খাঁ ঘোরীকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেন। হোশাং শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মোহম্মদ ঘোরী মাত্র এক বৎসর রাজত্ব করেই স্বীয় শ্যালক মাহমুদ খিল্‌জী (১ম) কর্তৃক বিষপ্রয়োগে নিহত হ'ন।

ঐ মাহমুদ খিল্‌জীই হোসাং শাহের সমাধিটি সমাপ্ত করেন। তিনি হোশাং শাহের আরও একটি অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করেন। তা' হলো জম্‌-ই-মসজিদের নির্মাণ। অপূর্ব গঠন এই মসজিদটিতে

কালো রঙের একটি প্রাচীর আছে যা কোনও অস্ত্রের সাহায্যেই বিদীর্ণ করা যায় না।

মাহমুদ খিলজী (১ম) মালবের সুলতানগণের মধ্যে সবচেয়ে সুখ্যাত। দু'একজন তাঁকে গোঁড়া মুসলমান রূপে বর্ণনা করলেও অধিকাংশ ঐতিহাসিকই তাঁর প্রশংসা করে গেছেন। তবকত্-ই-আকবরী গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে যে, তিনি মাণ্ডুতে এক মানসিক চিকিৎসালয় স্থাপন করেছিলেন। মধ্যযুগে ঐরূপ হাসপাতাল বোধহয় ঐ প্রথম।

জম্-ই-মসজিদ বা জমা মসজিদের সামনে আশ্রফি মহল। মালবের সুলতানগণের কবরস্থান ওটি।

দেখতে দেখতে আমরা পৌঁছলাম বাজবাহাদুরের প্রাসাদে। বাজবাহাদুরে প্রাসাদরূপে চিহ্নিত হ'লেও এটি কিন্তু সুলতান নাসিরুদ্দিন খিলজি কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল।

নাসিরুদ্দিন নামটি মাণ্ডুর তথা মালবের ইতিহাসে একটি কুখ্যাতি স্বরূপ। পিতা ঘিয়াসুদ্দিনকে হত্যা করে তিনি সিংহাসন অধিকার করেছিলেন। ঘিয়াসুদ্দিন ছিলেন চারু-শিল্প-কলা-সঙ্গীত-নৃত্যাদির একনিষ্ঠ অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক। আমোদ-প্রমোদে সময় কাটাতে তাঁর জুড়ি ছিল না। ধর্ম ও ধর্মীয় অনুশাসনের প্রতি তিনি ছিলেন অত্যধিক শ্রদ্ধাবান্।

সরলমতি ঘিয়াসুদ্দিনকে বহুজনে বহু প্রকারে প্রতারণা করতো। তিনি কিন্তু বিচলিত হ'তেন না। গল্প আছে, একদিন এক ব্যক্তি একটি গাধার খুর এনে বলে যে, এটি যীশুখৃস্টের গাধার খুর। ঘিয়াসুদ্দিন তখনই পঞ্চাশ হাজার টঙ্কা (টাকা) দিয়ে খুরটি কিনে নেন। পরে আরও তিনজন অনুরূপভাবে আরও তিনটি খুর আনলে তিনি সেগুলিও প্রতিটি পঞ্চাশ হাজার টাকা হিসাবে কেনেন।

কিছুদিন পরে আর একজন ঐরূপ একটি খুর নিয়ে এলে ঘিয়াসুদ্দিন তাও কিনতে উদ্যত হলেন। একটি কর্মচারী তখন তাঁকে বাধা দিয়ে বলে, যীশুর গাধার তো চারটিই পা ছিল। এ লোকটি পঞ্চম খুর কি করে পেতে পারে!

সুলতান বলেন : তা'তে কিছু এসে যায় না। এ নিশ্চয় সত্য কথাই বলছে। আগের চারজনের মধ্যেই কেউ হয়তো ভুল করে গেছে। একে পঞ্চাশ হাজার টঙ্কা দিয়ে দাও।

জহাঙ্গীরের স্মৃতি-কথায় বর্ণিত আছে, নাসিরুদ্দিন ঘিয়াসুদ্দিনকে বিষপ্রয়োগে হত্যার চেষ্টা করলে দু'বার তিনি 'জহর মোহ্রা' বা বিষ নিবারণী পাথরের দ্বারা সে বিষ নষ্ট করে রক্ষা পান। নাসিরুদ্দিনের তৃতীয় প্রচেষ্টা ঘিয়াসুদ্দিন পূর্বাহ্ণেই জানতে পারেন ও ঈশ্বরের উদ্দেশে বলেন,—প্রভু আমার আশি বছরের জীবনে তুমি অনেক দিয়েছো। এত সুখ এত ঐশ্বর্য বহুজনেরই ভাগ্যে জোটে না। তাই আমার মৃত্যুকে আমি নিয়মিত বলে মেনে নিচ্ছি। তুমিও তাই মনে করে নাসিরকে আমার মৃত্যুর জন্য দায়ী কোরোনা, তাকে শাস্তি দিওনা।

এই বলে তিনি সেই বিষমিশ্রিত পানীয় গ্রহণ করেন।

সম্রাট্ জহাঙ্গীর পিতৃহন্তা নাসিরুদ্দিনের সমাধি দেখতে গিয়ে তা'তে লাথি মারেন এবং পরিচারক-দেরও লাথি মারতে বলেন। তা'তেও খুশী না হয়ে সমাধিটি ভেঙে, দেহাবশেষ নর্মদার জলে নিক্ষেপ করতে আদেশ দেন।

মাণ্ডুর সবচেয়ে উঁচু জায়গাটিতে রূপমতীর মহল।

ছাদের উপর যে মণ্ডপটিতে বসে রূপমতী নর্মদাকে গান শোনাতো সেখানে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম সেই রাতের কথা। যে রাতে বাজবাহাদুর ও রূপমতীর প্রথম দেখা হয়েছিল দূরে প্রবহমানা নর্মদার তীরে।

এক মালবী সহযাত্রীর ডাকে চমক ভাঙলো : কি এত দেখছেন ?

বললাম : নর্মদাকে।

: কলকাতায় বুঝি নদী নেই বাবু ?

: আছে। তবে তা' অন্যরকম।

তিনি হেসে বললেন : বাবুজীর কথা যেন কি রকম ! নদীর আবার অন্যরকম কি ? নদী নদীই। তা' কলকাতার হোক আর মাণ্ডুতেই হোক।

উত্তর দিলাম না। কারণ, তফাৎটা ওঁকে আমি বোঝাতে পারবো না।

: চলুন গাড়ী ছেড়ে দেবে। সহযাত্রী বললেন।

চললাম।

পথে পড়লো Echo Point অর্থাৎ প্রতিধ্বনি কেন্দ্র।

আমরা থামলাম ওখানে।

পথের ধারে একখানা বড় পাথর দিয়ে চিহ্নিত করা একটি জায়গায় দাঁড়িয়ে কথা বললে আর কার্লভ দূরে অবস্থিত গম্বুজযুক্ত একটি ঘরের ভিতর থেকে তার সুউচ্চ প্রতিধ্বনি উৎক্ষিপ্ত হয়ে বহুদূর পর্যন্ত শোনা যায়।

প্রতিধ্বনি কেন্দ্রের কাছে, পথের ধারে, একটা গাছতলায় বসে ছিল দশ বারোটি ছেলে। চেহারা অনেকটা সাঁওতাল পরগণার গ্রামবাসীদের মতো। কয়েকজনের হাতে পাচন-বাড়ি। তাদের গরুগুলো অদূরে চরছে। দু'জনের হাতে তীর ধনুক। বাকি সকলের হাতেই পদ্মফুল। যাত্রীরা যদি কেনে সেই আশায় এনেছে।

ওরা ভীল। সবারই খালি গা। যাদের জামা আছে তারা তা' খুলে গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখেছে।

একটা ছেলে তার শার্টটা খুলে তাই দিয়ে একটা হাত ঢেকে রেখেছে। মুখটা বড়ই যন্ত্রণা-কাতর। প্রশ্ন করায় জানালো, গাছ থেকে পড়ে হাত ভেঙে গেছে।

সঙ্গে ছিলেন ইন্দোরের এক ডাক্তার। তিনি জোর করে জামাটা সরাতেই দেখা গেলো হাতটা দারুণ ফুলে রয়েছে ও ছড়ে যাওয়া জায়গাগুলোয় ঘা ধরেছে। মাটির মতো কি একটা জিনিসের প্রলেপ লাগিয়েছে।

ডাক্তার সাহেব বললেন : ইস্, কি অবস্থা দেখছেন !

ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলেন : হাসপাতালে গিয়েছিলি ?

সে বললো : না। আমার দিদিমা বারণ করেছে ওখানে যেতে নেই। আমাদের গাঁয়ের একজন গিয়েছিল ফিরে আসেনি।

ডাক্তার বললেন : শুনলেন তো কথা। কাছেই (২২ মাইল দূরে) জেলা হাসপাতাল। এরা এমনি করে মরবে, তবু সেখানে যাবেনা।

আমার বিশ্বাস এদের নিশ্চয় Witch Doctor বা রোজা আছে। তাকে এরা নিশ্চয় খুব বিশ্বাস করে। তার ঐশী শক্তির কথা এরা জানে। সে খানিকটা মাটি গুলে খেতে দিলে তাই খেয়েই এরা

নীরোগ হয় —এরা পাথুরে মাটির মানুষ। বিশ্বাস আর অবিশ্বাস দুটোই এদের দূরের পাহাড়টার মতোই মজবুত। জাগ্রত হোক বা সুপ্ত হোক, অটল বিশ্বাস এদের সম্পদ। ওতেই এরা ভাল হয়ে যায়,—এরা বাঁচে।

ডাক্তার সাহেবকে বললাম: ভড়ি-বটি, ধুলো-পড়া, জল-পড়া চলছে বোধহয়। ওতেই ভাল হয়ে যাবে।

আমাদের সঙ্গে একজন মেডিক্যাল্ ছাত্রও ছিলেন। তিনি গর্জে উঠলেন: মেডিক্যাল সায়েন্স ওকথা বিশ্বাস করে না।

আমার তরুণ বন্ধুটি হয়তো জানেন না, ভারতবর্ষ ওকথা বিশ্বাস করে। মনের রোগ নিরাময়-কারী শক্তির কথা এদেশে অতি প্রাচীনকাল হতেই জানা আছে। মন নামক ইন্দ্রিয়টি সকল ইন্দ্রিয়ের উপরই প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম। বিদেশী আখ্যার ঐ Witch Doctor আর রোগী যখন একাত্মা হয়ে খানিকটা ধুলোকেই আরোগ্যকারী জ্ঞানে প্রয়োগ ও গ্রহণ করে তখন তাদের যৌথ ও একীভূত মনের শক্তিতে রোগ নিরাময় অসম্ভব নয়। ধুলোটা উপলক্ষ্য মাত্র।

একটি ছেলেকে হিন্দীতে জিজ্ঞেস করলাম: তোমরা পড়ো না?

সে বুঝতে পারলো না।

একজন সহযাত্রী স্থানীয় ভাষায় আমার প্রশ্নটা বুঝিয়ে দিতেই মুচকে মুচকে হাসতে লাগলো এবং সঙ্গী ভদ্রলোককে যা বললো তার অর্থ হলো, ওরা পড়বার জন্য স্কুলে গিয়েছিল। তবে এখন আর যায় না। মাস্টার মেরেছিল তাই ছেড়ে দিয়েছে।

বাস্-এর ড্রাইভার হর্ন বাজিয়ে যাওয়ার নোটিশ দিলেন।

আমরা বাস্-এ উঠলাম।

একটা কথা বলা হয়নি।

বাজবাহাদুর রূপমতীকে বলেছিলেন,—তোমার অন্তরে বাইরে এত রূপ। তাই তোমার নাম রাখলাম, রূপমতী।

রূপমতী তার অন্তরের রূপ প্রকাশ করেছিল।

আকবর বাদশাহের সেনাপতি মাণ্ডু অধিকার করলে, বাজবাহাদুরের রূপমতী বিষপানে আত্ম-বিসর্জন দিয়েছিল।

জিজ্ঞাসা

প্রশ্ন	উত্তর
১ আগ্রা নামটি কি থেকে হয়েছে জানেন ? —সুবীর দত্ত, আসানসোল।	১ ব্রজ-রাজ্যের চুরাশি বনের মধ্যে ছিল অগ্রবন। ঐ অগ্র শব্দ হ'তে হয়েছে,—আগ্রা।
২ কোথায় যেন পড়েছিলাম অর্ধ-গঙ্গা নামে একটি নদী আছে। আপনারা জানেন কি ? —তড়িৎ কুণ্ডু, কুলটি।	২ দক্ষিণাপথের কাবেরী নদীকে অর্ধ-গঙ্গা।
৩ যুগাদ্যা মানে কি ? —মীরা দত্তরায়, কলিকাতা।	৩ বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়া অর্থাৎ অক্ষয় তৃতীয়া, জগদ্ধাত্রী পূজার দিন অর্থাৎ কার্তিকী শুক্লা-নবমী, শ্রাবণী কৃষ্ণা ত্রয়োদশী এবং মাঘী পূর্ণিমা তিথির নাম—যুগাদ্যা। ঐ দিনগুলিতে যথাক্রমে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগ আরম্ভ হয়েছিল।
৪ জ্বালামুখী কি ভাবে যেতে পারি ? —বিজয় কুমার বসাক, বহরমপুর।	৪ শিয়ালদহ থেকে রেলপথে পাঠানকোট। পাঠান কোট থেকে বাস্-এ। অথবা, পাঠানকোট থেকে জোগিন্দার গেঞ্জ ট্রেন্-এ জ্বালামুখী রোড ও সেখান হতে বাস্-এ।
৫ কাম্বোজ দেশ কোথায় ? —সর্বেশ্বর গুহঠাকুরতা, কলিকাতা।	৫ আফগানিস্থানের প্রাচীন নাম কাম্বোজ।
৬ গোপালপুর—অন—সী যেতে চাই। পথ বলে দেবেন ? —রিতা রায়, বোলপুর।	৬ হাওড়া হ'তে মাদ্রাজের পথে বহরমপুর (গঞ্জাম)। বহরমপুর থেকে বাস্-এ যাবেন।

॥ প্রশ্ন ॥

৭ শ্রীরাধিকা কোথাকার মেয়ে ছিলেন ? বৈষ্ণবরা যে বলেন 'রাধা' নামটির অর্থ অসাধারণ তা' কি সত্য ?
—হিরণ্ময় বসু, কৃষ্ণনগর।

৮ গত বছর ফাল্গুন সংখ্যার জিজ্ঞাসায় আপনারা নাগুর-এর দরগা সম্বন্ধে উল্লেখ করেছিলেন। দরগাটির বিষয়ে বিশদভাবে জানাতে পারেন।
—সিরাজুল হুদা, জিয়াগঞ্জ।

॥ উত্তর ॥

৭ শ্রীরাধার পিতা বৃষভানু। মাতা কলাবতী। মথুরা জিলার বা তদানীন্তন শূরসেন রাজ্যের বর্ষানা গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। রাধা নামটির অর্থ,—কোটী জন্মার্জিত পাপ, শুভাশুভ কর্মভোগ, গর্ভবাস-মৃত্যু রোগ, আয়ুক্ষয় এবং সংসার বন্ধন মোচনকারী।

৮ দরগাটি হজরত্ সৈয়দ শাহ্ল্ হামিদ সাহেবের দরগা নামে প্রসিদ্ধ।
অযোধ্যার কাছে মাণিকপুর গ্রামে ৯১০ হিজরী সনে ঐ মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম, সৈয়দ হাসান ও মাতার,—বিবি ফতিমা।
তিনি হজরত্ মোহম্মদের ২২তম উত্তর পুরুষ-রূপে চিহ্নিত। আট বছর বয়সেই তিনি আরবী ভাষায় বুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন গোয়ালিয়রের হজরত সৈয়দ মোহম্মদ ঘোষির কাছে। চারশ' চারজন স্বীয় শিষ্য সহ তিনি মক্কা-মদিনা তথা বহু দেশ পরিভ্রমণ করেছিলেন। রোগ নিরাময়, মৃতকে পুনর্জীবন দান প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর বহু অলৌকিক কাহিনী আছে। তঞ্জোর-রাজ অচ্যুতাপ্পা নায়কের আনুকূল্যে শেষ পর্যন্ত তিনি নাগুর-এ বাস করতে থাকেন এবং সেখানেই দেহরক্ষা করেন।

শ্রীমতী শুভ্রা বসু

CALCUTTA UNIVERSITY

সম্পাদিকা : শ্রীমতী শুভ্রা বসু

বার্ষিক পরিষদ্ পত্রিকার পক্ষে শ্রীমতী শুভ্রা বসু কর্তৃক প্রিন্টস্মিথ, ১১৬, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত এবং ৮।১।১-এফ, বীরপাড়া লেন, কলিকাতা-৩০ হইতে প্রকাশিত। প্রচ্ছদ মুদ্রণ : ইম্প্রেশন হাউস, কলিকাতা-৯। প্রধান কার্যালয় : ১৯, রামমোহন মুখার্জি লেন, হাওড়া-১। ফোন : ৬২-৮৭০৩। গ্রাম্ : আত্মারাম।

বিভাগীয় সম্পাদক : শ্রী কমল বন্দ্যোপাধ্যায়

Registration No.
R. N. 27175 75
Regn. (Postal) No.
WB/NC. 143 DI. 25.4.75

YATRIK

PARISAD PATRIKA

A Monthly Magazine on
tourism & Indology

Chaitra : 1383 B.S.
Mar. - Apr. '77
Price : 90 Paise.
মূল্য : ৯০ পঃ